নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

জুলাই ২০১৭ ■ আষাঢ় - শ্রাবণ ১৪২৪

সৌজন্য সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসহাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ফিরোজ চন্দ্র বর্ম্মন

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সানিয়া ইফফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

মানুষের মতো রোবট বানানোর খুব চেষ্টা চলছে বিশ্বজুড়ে। আমাদের দেশেও চলছে এই কাজ। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বানানো রোবট প্রায়ই তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। তোমার মতো নবারুণের খুদে বন্ধুদের খুব আগ্রহ রোবট নিয়ে। আর তাই নবারুণ এবার এসেছে রোবট সম্বন্ধে নানান কথা জানাতে। দারুণ অবাক হবে, খুদে লেখক আব্দুল্লাহ্-আল-মারুফ আস্ত একটা সায়েন্স ফিকশন-ই লিখে ফেলেছে রোবট নিয়ে। **টিউনিয়ান ষড়যন্ত্র** নামের গল্পটি পড়ে দেখো, খুব মজা পাবে। আরো আছে খ্যাতিমান লেখকদের সায়েন্স ফিকশন নিয়ে লেখা রোবট বিষয়ক নিবন্ধ। কেউ যদি রোবোটিক্স বিষয়ে পড়ালেখা করে রোবট বানাতে চাও, সে তথ্যও পাবে।

কেবল কি এইটুকু? উহু! সবার প্রিয়, বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব এঁকে দিয়েছেন রোবট নিয়ে কমিকস। কেবল তোমাদের জন্যই।

বন্ধুরা, সংখ্যাটি তোমাদের কেমন লাগল জানাতে ভুলো না কিন্তু। তোমার মতামত বা সমালোচনা লিখে পাঠিয়ে দাও নবারুণের ই-মেইল ঠিকানায় (editornobarun@dfp.gov.bd)। ডাক পাঠাতে পারো এই ঠিকানায়: সম্পাদক, নবারুণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

আর হ্যাঁ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ পড়তে পারো। facebook.com/ nobarunpotrikabd সাইটে গিয়ে সংযুক্ত হও নবারুণের সাথে।

রোবোটিক নিবন্ধ

১০ কারেল চাপেকের রোবট / নাদিরা মজুমদার
১৪ রবিবট ও নওরিন / আহমেদ রিয়াজ
১৭ সায়েন্স ফিকশনের যন্ত্রমানব / শামস সাইদ
২২ ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন, রোবট ও একজন আইজ্যাক আসিমভ / আবুল বাসার
৪২ হরেক রকম রোবট / সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি
৪৪ সিনেমার 'রোবু'রা / নাবীল অনুসূর্য
৪৬ রোবোটিক্সের অনন্য জগৎ / নাদিম মজিদ
৪৭ 'রোবোটিক্স' পড়তে চাও? / শান্ত শাহরিআর
৪৯ রোবটের টুকিটাকি / শাহানা আফরোজ

নিবন্ধ

৫২ গল্পের মতো বর্ষা / ফারুক হাসান
৫৫ চিকুনগুনিয়া / ডা.হাফিজ উদ্দীন আহমদ

রোবোটিক কল্পকাহিনি

০৫ অরণি ও রোবট / ধ্রুব এষ
২৪ একদিন এক রোবট কারখানায় / মঈনুল আহসান সাবের
৩০ বন্ধু রোবট / দীপু মাহমুদ
৩৩ রোবাক্ত / মোহাম্মদ শাহ আলম
৩৫ তিতির বন্ধু / নাসরীন মুস্তাফা
৪০ প্রথম সূত্র / হাসান খুরশীদ রুমী

রোবোটিক কবিতা

০৭ লোকমান আহম্মদ আপন / রোকসানা গুলশান
রুস্তম আলী / সাঈদ তপু

কবিতা

৫০ হাসনাত আমজাদ / অতনু তিয়াস / মো. শহিদুল ইসলাম
৫১ নাসিরুদ্দীন তুসী / মাসুমা রুমা / নূর হোসেন
৫৩ আবেদীন জনী
৫৪ সমীরণ বড়ুয়া/ কামাল হোসাইন
৫৫ মনজুরুল রহমান

রোবোটিক কমিকস

০৮ ডাইরোবট ■ আহসান হাবীব

ছোটোদের রোবোটিক কল্পকাহিনি

০৩ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি: টিউনিয়ান ষড়যন্ত্র
—আব্দুল্লাহ্-আল-মারুফ

ছোটোদের রোবোটিক কবিতা

৪৮ রোবট/উম্মে সুমাইয়া

ছোটোদের ছড়া

৫৭ তানজিল দেলওয়ার খান (রিজ) / মো: রিদওয়ানুল ইসলাম রিফাত
সাইদুল ইসলাম / সালেহীন শরীফ

প্রতিবেদন

৫৬ চলে গেলেন হরিধামের উদ্ভাবক হরিপদ কাপালী / সুলতানা বেগম
৫৮ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ / তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৮ নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য / জান্নাতে রোজী
৫৯ চ্যাম্পিয়ন ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলাদেশ / মেজবাউল হক
৬০ খেলতে খেলতে বুদ্ধি বাড়াও / মো. জামাল উদ্দিন
৬১ আনন্দ সংবাদ / প্রসেনজিৎ কুমার দে
৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ/সাদিয়া ইফফাত আঁখি

ছোটোদের আঁকা

৬২ নাফিশা জাহান খান / লামিয়া আক্তার
৬৩ ইসতিয়াক আহমেদ আবির / শুকি
৬৪ রাইদা জামান / সাদিয়া হোসেন মিম
৬৫ প্রিয়তি সালেহ উদ্দিন / তাসনোভা আলম লিশান

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে চিকুনগুনিয়া নামের এক রোগ। অদ্ভুত এই নামের অর্থ নাকি কুঁকড়ে যাওয়া। জ্বর, হাড়, মাংসপেশী ও গিটে খুব বেশি ব্যথা হয়। শরীর আসলেই কুঁকড়ে গেছে বলে মনে হয়। মশা এই রোগের বাহক। তাই মশার বিস্তার যাতে ঘটতে না পারে, খেয়াল রেখো সেদিকে। চিকুনগুনিয়া ঠেকাতে জানতে হবে এ রোগ নিয়ে আরো অনেক কিছু। আর তাই পড় পৃষ্ঠা ৫৫ - ৫৬

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি

টিউনিয়ান ষড়যন্ত্র

আব্দুল্লাহ্-আল-মারুফ

: ধ্রুব এষ

আমি আব্দুল্লাহ্-আল-মারুফ। পড়ালেখা করি। অবসর সময়ে বিভিন্ন গল্পের বই ও ম্যাগাজিন পড়ি। আমার একটা অদ্ভুত স্বভাব রয়েছে। গল্পের বই বা কোনো কিছু হাতে পাওয়ার পর প্রথমে লেখকের নাম দেখে নিই। তারপর বইটা খুব দ্রুত পড়ি। পড়ার পর কল্পনা করি লেখক বইয়ের এ অংশে আরো কি কি দিতে পারতেন। নিজের কল্পনার ভেতরে একটা প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলি।

বন্ধুদের কাছে এসব নিয়ে আলোচনা করলে তারা হাসাহাসি করে এবং বলে, তুই একটা বই লিখে ফেললেই তো পারিস। তখন কথা না বাড়িয়ে চলে আসি।

সেদিনের কথা, স্কুল থেকে ফিরছি। ভাবছি প্রচ্ছদ শিল্পী ধ্রুব এষ বা ছোটোদের ধুমমামাকে নিয়ে। তার নিজের লেখার মাধ্যমেই ছোটোরা তাকে ধুমমামা নামে চেনে। ধুমমামা বর্তমানে প্রচ্ছদ করার সাথে সাথে দু-চারটে গল্পও লিখে ফেলেন। তার অধিকাংশ গল্পের বিষয়ই থাকে টিউনিয়া গ্রহ ও টিউনিয়ান। (এ প্রর্যন্ত আমার পড়া গল্প গুলোর ভেতর)। কি বিজ্ঞান চিন্তা, কি নবারুণ বা কি কিশোর আলো – সব খানেই টিউনিয়া ও টিউনিয়ানদের নিয়ে লিখেছেন। একটা গল্পে তো লিখেছেন যে, একটা টিউনিয়ান উনত্রিশ বছর ধরে তার নিউরনে ঢুকে বসেছিল। বাব্বারে , টিউনিয়ানটার ধৈর্য কত!!

বাবা যদি আমাকে ২ ঘণ্টার জন্য একটা রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা মেরে বলেন পড়ার জন্য, তাহলে আমি শেষ। তা যাহোক, আমি ভাবলাম, সত্যি সত্যিই হয়তোবা কোনো টিউনিয়ান তার মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে দিয়ে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি গুলো লিখিয়ে দিচ্ছিল।

এসব জবরজং বিষয় ভাবতে ভাবতেই অটো বাড়ির রাস্তায় চলে এল। ফলে ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়তে হলো। বাসায় খাওয়া-দাওয়া, গোসল ও একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে মাঠে খেলাধুলার জন্য গেলাম। বেশি লোকজন আসেনি। মাঠের এক কোণায় বসে আবার ভাবতে শুরু করলাম। ভাবলাম , এখন যদি এ মাঠে একটা টিউনিয়ান শিপ এসে পড়ত তাহলে দারুণ হতো। তাদের সঙ্গে একটু খেলাধুলাও করতে পারতাম। ভাবতে ভাবতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে টের পাইনি। যখন মাঠ থেকে চলে যাব, তখন হঠাৎ গুম গুম শব্দে মাটি কেঁপে উঠল। ভূমিকম্প হচ্ছে ভেবে মাটিতে বসে পড়লাম। আগে-পেছনে তেমন একটা গাছপালা বা ভবন নেই। অনেক দূরে আছে। দেখলাম একটা হেলিকপ্টারের মতো কিছু মাটিতে নেমে ইঞ্জিন বন্ধ করে বসে রইল । তারপর হঠাৎ যন্ত্রটা থেকে দুটো আলো বেরিয়ে মাঠের উপর পড়ল। একটি উজ্জ্বল সার্চলাইট, অন্যটি এক্স-রে ভিশন রশ্মি।

ভাবলাম হয়তোবা কোনো ভিআইপি এসেছে, তাই মাঠ আলোকিত করার ব্যবস্থা করেছে। দৌড়ে কাছে গেলাম। কখনো হেলিকপ্টার ছুঁইনি, কিন্তু দেখেছি। তাই ভাবলাম একটু ছুঁয়ে দেখব। কিন্তু কাছে যাওয়ার আগেই লাল একটা আলো জ্বলে উঠল এবং অদ্ভুত শব্দ হতে লাগল যেন রেড সিগন্যাল বেজে উঠেছে । আমি দৌড়ে মাঠের কিনারায় সরে পরার চেষ্টা করলাম কিন্তু একটা কাচের গোলকে আটকা পড়লাম। দেখতে দেখতে যানের চারপাশে ও পাশের মাঠের চারদিকে বিরাট কাচের গোলকে ঢুকে পড়লাম। পুড়োবাড়ির মতো ভৌতিক লাগছিল যানটাকে। যানটার ভেতর থেকে রোবটের মতো বিশাল দেহি দুজন মানুষ বেরিয়ে এল। কাছে এলে বুঝতে পারলাম এরা আসলে কাচের তৈরি। আমার কাছে আসতেই কাচের গোলক সরে গেল। একজন একটা লম্বা পাইপের মতো একটা জিনিস ও অন্য একজন একটা চারকোনা জিনিস আমার পাশে ধরল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম।

হঠাৎ চারকোনা জিনিসের ভেতর থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর এলো, 'টিউনিয়ান নিরাপত্তাবলয় 0050c0-2 তে আপনাকে স্বাগতম। এই পুরো মাঠের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা কাচের গোলক গুলো হলো নিরাপত্তাবলয় যা হাইড্রোজেন ও পারমাণবিক যুদ্ধেও টিকে থাকে।'

তারপর দুইজন আগন্তুক মিলে আমাকে জোর করে তাদের যানের ভিতরে নিয়ে গেল । যানের উপরে বড়ো করে ইংরেজি 'T' লেখা। যানের ভেতরে একটা স্ক্রিনে লেখা ফুটে উঠল 'Tritons of The Tunia' বুঝলাম এটা এই শিপের নাম। ভেতরে অসংখ্য ধরনের যন্ত্রপাতি যা কখনো চোখে দেখিনি। হঠাৎ চারকোনা বইয়ের ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, 'সামনের বোর্ডটা হলো এখানকার কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড যা পুরো স্কাউট শীপকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেন্সর বোর্ডের কাছে এরকম চারটি পৃথিবী একসঙ্গে ধ্বংস করার মতো শক্তি রয়েছে।'

যানের ভেতরে ওরা আমাকে একটা লেজার বিমের খাচায় বন্দি করে রাখল যেন পালাতে না পারি। একটা রোবট আমার কাছে এগিয়ে এলো সেটা কাচের তৈরি। আমাকে বলল, তোমার নাম কি।

আমি জবাব দিলাম। তারপর আমাকে পাশের আরেকটি খাচার দিকে তাকাতে বলল। আমি তাকিয়ে আঁৎকে উঠলাম। অন্য খাচার ভেতরেও আরেকটা আমি।

রোবটের থেকে জানতে পারলাম ওটা সমান্তরাল বিশ্বের (Paralal World) অন্য আমি। তারপর টিউনিয়ানদের একজন আমার কাছে এসে গড় গড় করে বলতে লাগল, 'এখন থেকে সাড়ে ১৩ লক্ষ বছর পরের গ্রহ টিউনিয়া। এখন থেকে ৪ লক্ষ বছর পর পৃথিবী ধ্বংস হবে। পৃথিবীর ধূলিকণা ও মহাজাগতিক মেঘ আবর্তিত হয়ে আলফা সেন্টোরি নক্ষত্রের চারপাশে আবর্তনকারী একটা নতুন গ্রহের জন্ম হবে, যার নাম হবে টিউনিয়া। আমার নম্বর (এস k-52) আর 7.13 minute বা তোমাদের হিসাবে ৩৪ মিনিট পরে হাইপারজাম্প হবে যার ফলে আমরা পৌছব টিউনিয়ার নিকটবর্তী মহাকাশ স্টেশনে যার নাম 'Alpha Tunian' সেটা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত। আর আমাদের যানটা একটা সময় পরিভ্রমণকারী। এখন তোমাকে কিছু পরীক্ষার জন্য আমাদের গবেষণাগারে নিয়ে যাব।'

আমাকে জোর করে গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা রোবট আমার কানের ভেতরে একটা ছোট্ট বলের মতো জিনিস ঢুকিয়ে দিল। তারপর একটা ঘড়ির মতো যন্ত্র দেখিয়ে বলল, 'আমাকে রোবট ভাবলেও আমি টিউনিয়ান। এখন থেকে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। যখন যা ভাববে তাই হবে । যতই তুমি টিউনিয়ানদের নিয়ে ভাববে ততই তুমি নতুন টিউনিয়ান সৃষ্টির সহায়ক হবে।'

হঠাৎ চমকের মতো আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অল্পবয়সী টিউনিয়ানকে বন্ধু বৎসল ভাবলাম এবং ভাবলাম যে টিউনিয়ানটা আমাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌছে দেবে। কিন্তু হঠাৎ রোবটের মতো টিউনিয়ানটা আমাকে নিয়ন্ত্রণের রিমোটটা টিপে দিল এবং আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি।

৮ম শ্রেণি, মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা

রোবোটিক কল্পকাহিনি

অরণি ও রোবট

ধ্রুব এষ

দুপুরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

এখন ঘুম থেকে উঠে দেখি, সকাল হয়ে গেল নাকি রে!

'না, সন্ধ্যা।'

কে বলল রে? কে বলল?

দেখি একটা রোবট। আমি রোবট চিনি। ইংলিশে রোবট বানান করতে পারি। আর ও বি ও টি। রোবট শব্দের অর্থ যন্ত্রমানব জানি। এছাড়া আমার তিনটা টয় রোবট আছে। একটা আমার তিনাপিপি দিয়েছে, একটা ফরিদ মামা দিয়েছে, আর একটা কে যে দিয়েছে, ইস্‌রে, আমার তো মনেই নেই।

এই রোবটটা টয় রোবট না। সত্যিকার সত্যিকার রোবট। কোত্থেকে এল রে?

আমি বললাম, 'হাই, রোবট।'

রোবট বলল, 'হাই, অরণি।'

আমি তো আশ্চর্য!

'এ মা! তুমি আমার নাম জানো দেখি।'

'আমি তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানি।'

এ আবার কী রকম কথা! আমার সম্পর্কে সবকিছু জানে মানে? আমি আমার বাবাকে কী ডাকি জানো? আমি আমার মাকে কী ডাকি জানো? আমি আমার বাবাকে ডাকি 'বাপা'। মাকে ডাকি 'মু'।

বাপা আর মু প্রতিদিন আমার আগে ঘুম থেকে ওঠে। ও না, এখন তো সন্ধ্যা। বাপা তাহলে এখনো অফিস থেকে ফিরেনি। মু ড্রয়িংরুমে ছাত্রী পড়াচ্ছে।

আমি বললাম, 'রোবট।'

'আমার একটা নাম আছে, অরণি।'

'তাই নাকি? তোমার নাম কী?'

'আমার নাম ইসকুট।'

'কী! বিস্কুট! হি! হি! হি!'

'বিস্কুট না ইসকুট। বি না, ই। হ্রস্ব-ই।'

'ইসকুট। হি! হি! হি! ইসকুটই বা কেমন নামটা?'

'মানুষের নাম নিয়ে হাসতে নেই, অরণি।'

'তুমি কি মানুষ?'

'না, আমি রোবট। রোবটের নাম নিয়েও হাসতে নেই। নিজের নাম কী নিজে রাখে কেউ? তোমাদের পৃথিবীতে অবশ্য রাখে কেউ কেউ। ক্যানসাসের এক ছেলে, এই তো কালই, কোর্টে গিয়ে নিজের নাম নিজে রেখেছে। হট চিকেন চিলি ফ্রাই। মানে কী? গরম মুরগি মরিচ ভাজা। একজন মানুষ পছন্দ করে তার নিজের নাম রেখেছে গরম মুরগি মরিচ ভাজা।'

'কী! হি! হি! হি! সত্যি? সত্যি?'

'রোবটরা মিথ্যা বলতে পারে না, অরণি।'

'মু কি তোমাকে দেখেছে?'

'না। তোমার মু তো ছাত্রী পড়াচ্ছেন।'

'মু ছাড়া তো এখন বাসায় কেউ নেই। মিতিল বু গেছে তার গ্রামের বাড়িতে। তুমি তাহলে এই ঘরে কী করে ঢুকলে?'

'তুমি একজন বুদ্ধিমতী, অরণি। আমি এই জানালা দিয়ে পড়েছি।'

'পড়েছো!'

'হ্যাঁ, স্পেসশিপ থেকে পড়ে গেছি।'

'স্পেসশিপ থেকে!'

'হ্যাঁ, অরণি। আমি তোমাদের এই পৃথিবীর না, অনেক দূরের আরেকটা পৃথিবীর রোবট। আমাদের পৃথিবীটার নাম আর্ধা। স্পেসশিপ নিও-থ্রি থ্রি থ্রি আমাদের নিয়ে মায়াকা গ্রহে যাচ্ছিল। শায়া ছায়াপথের গ্রহ মায়াকা। তোমাদের গ্রহ পার হয়ে যেতে হয়। যান্ত্রিক কিছু একটা ত্রুটির কারণে আমি নিও-থ্রি থ্রি থ্রি থেকে ছিটকে পড়ে গেছি। ঘটনাক্রমে তোমার ঘরে পড়েছি।'

'কী বলেরে! ওরে ইসকুটরে! তোমার কথা শুনে তো আমার মাথা মেরি গো রাউন্ডের মতো ঘুরছে রে!'

'তুমি বুদ্ধিমতী, অতি বুদ্ধিমতী। শান্ত হও, অরণি। চিন্তা করো না। আমি তোমাকে কোনোরকম যন্ত্রণায় ফেলব না। নিও-থ্রি থ্রি থ্রি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এক্ষুনি।'

'এক্ষুনি?'

'আর ১ মিনিট ১ সেকেন্ড।'

'মুকে ডাক দেই?'

'তোমার মু এখন আরেক পৃথিবীতে আছেন, অরণি। তুমি এই পৃথিবী থেকে ডাকলেও শুনবেন না। ১ মিনিট ১১ সেকেন্ড পর তোমরা আবার এক পৃথিবীতে থাকবে।'

কী বলেরে! মু আরেক পৃথিবীতে আছে, আমি আরেক পৃথিবীতে আছি! কী এসব! আমি কী বোকা? এতোটাই বোকা নাকি যে কোথাকার একটা রোবটও আমাকে বোকা বানাচ্ছে! রাগ হলো এত। এহ্! রোবট তো রোবট, তার আবার একটা নাম আছে ইসকুট! ইসকুট না বিস্কুট। তুই থিন এয়ারুট বিস্কুট। বাপা আর মু চায়ের সঙ্গে খায়। আমি একটুও পছন্দ করি না।

'তোমার বিশ্বাস হয়েছে, অরণি?'

ইসকুট বলল।

আমি তাকে রাগ না দেখিয়ে বললাম, 'মাত্র তুমি আমাদের ঘরে পড়েছ, ইসকুট। আমার সম্পর্কে সব তুমি কী করে জানলে?'

'বললাম না তুমি বুদ্ধিমতী। খুব ভালো। ছিটকে তোমাদের ঘরে পড়েছি, আমার একটা দায়িত্ব আছে না? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু জানে ডিপ পার্পল। ডিপ পার্পল হলো সুপার কম্পিউটার। সে আমার মেমোরিতে সব ইনস্টল করে দিয়েছে।'

'তোমাদের গ্রহজগতে তোমরা কি বাংলায় কথা বলো?'

'নাহ্। আমাদের নিজস্ব ভাষা আছে, অরণি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে তো, এজন্য বাংলা ভাষাও আমার মেমোরিতে ইনস্টল করে দিয়েছে ডিপ পার্পল।'

'অ।'

আশ্চর্য! এতক্ষণে কী না আমি ভাবলাম, আসলেই একটা রোবট কী ও? না আমার বুলবুলি পাখিমামা! মু-র ভাই, আমার মামা। তার নাম হলো বুলবুল। আমি ডাকি বুলবুলি পাখিমামা। ছোটো থেকে ডাকি। বুলবুলি পাখিমামা হলো এই পৃথিবীর সেরা মজার মানুষ। একদিন ছোটো সাইজের একটা কিং কং সেজে এসেছিল সে, একদিন 'পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান' সিনেমায় জ্যাক স্প্যারো হয়েছিল। আরো কত কী। আজ ঠিক রোবট হয়েছে।

'আর তিন সেকেন্ড, অরণি। আমি যাচ্ছি। বিদায়।'

ইসকুট রূপী বুলবুলি পাখিমামা বলল।

আমি হাসলাম, 'তুমি ধরা পড়ে গেছ বুলবুলি পাখিমামা।'

সঙ্গে সঙ্গে যে কী ঘটল। নীল একটা আলোর ঝলকের মতো এই দেখলাম এই নেই ঘরে। ইসকুটও নেই। বুলবুলি পাখিমামা না তবে, সত্যিকার সত্যিকার একটা রোবটই ছিল সে। আর্ধা গ্রহের রোবট। সেই গ্রহটা কোথায়? আমি বড়ো হয়ে যাব একদিন।

আমার রোবট

লোকমান আহম্মদ আপন

মিডিয়াকে কাল জানিয়েছি আমি
একটি রোবট বানিয়েছি আমি।
সে রোবট বুঝে আমার ইশারা
হয়নি বলো আমার কী সারা!

অনেক কিছুই করে সে আমার
মুখস্ত পড়া ধরে সে আমার
না বুঝা পড়া দেয় শিখিয়ে
পড়ার পরে তা নেয় লিখিয়ে।

আমার সাথে সে যায় ইসকুলে
বিস্কিটও সে খায় পিস খুলে
সকল সময় থাকে সে পকেটে
মাঝে মাঝে রাখি গলার লকেটে।

দুষ্টু ছেলেরা আমাকে ডরায়
সাহস দিয়ে তা রোবটই করায়
ভালো কাজে দেয় শক্তি আমায়
মন্দ কাজে সে আমায় থামায়।

রোবট

রোকসানা গুলশান

মেশিন মানুষ আমি যে এক
নামটি রোবট,
দেখে শুনে পা ফেলি তাই
খাই না তো হোঁচট।

অর্ডার মেনেই করতে পারি
হাজার কঠিন কাজ যে,
বর্ণ-বিভেদ কোনো কিছুই
নেই যে আমার রাজ্যে।

রামগুড়ুরের ছানার মতোই
হাসতে আমার মানা,
সহজ-কঠিন বাঁধার মানে
আছে সবই জানা।

ইচ্ছে করে তোমার মতোই
ওড়াই ইচ্ছে ঘুড়ি
বৃষ্টি দিনে আচ্ছা করে
চিবাই রে ঝাল মুড়ি।

রোবট

রুস্তম আলী

মানুষ একদিন অলস বসে-
দেখবে চেয়ে রোবট করছে কাজ।
রোবট কারো গলার মালা হবে-
আবার কারো গলার ফাঁস।

মান অভিমান নাই ওদের
সুস্থ, সরল দেহ।
রাগ, আবেগের ধার ধারে না
শত্রু নাহি কেহ।

খানাপিনা নাই রোবটের
কাজের বেলায় কাজি।
এত কিছু অর্জন ওদের-
শুধুই প্রযুক্তি।

রোবট

সাঈদ তপু

কল্পকথার গল্প নয়
আলোর মতন সত্য
বিজ্ঞানীদের হাতে এখন
সৃষ্টির অনেক তত্ত্ব।
এই সৃষ্টির উল্লাসে আজ
কাঁপছে ভুবনময়
কল্পনাকে ছিটকে ফেলে
বিজ্ঞানেরই জয়।
পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়
এক রিমোটে বন্দি
বিজ্ঞানের এই যজ্ঞে মহা
একটু যদি মন দি।
দেখব তবে বিজ্ঞানীদের
কোন উঁচুতে দৃষ্টি
রোবট নামের যন্ত্রমানব
বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি।
চলতে পারে, খেলতে পারে
সকল কাজই করতে পারে
মানবরূপী যন্ত্র।
সৃষ্টিশীল এই বিশ্বে রোবট
বর্তমানে বিজ্ঞানের এক
বিস্ময়কর মন্ত্র ।

ডাইরোবট!

আহসান হাবীব

একটু পর
একি কাণ্ড !!
?
?!?
হায় হায় ওকে কটা ডালপুরি আনতে হবে বলা হয়নি। তাই পুরো ডালপুরির দোকানই উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছে মনে হচ্ছে !!
বাঁচাও! বাঁচাও!!
?

রোবোটিক নিবন্ধ

কারেল চাপেকের রোবট

নাদিরা মজুমদার

রোবট জন্মকাহিনি

'রোবট' শব্দটির জন্ম গত শতাব্দীর ১৯২০ সালে। কারেল চাপেক ১৯২০ সালে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ভিত্তিক নাটক লেখেন, নাম দেন 'রসুমভি উনির্ভাজালনী রবোতি', ইংরেজি সংক্ষেপ: আর.ইউ.আর (বাংলায় 'রসুমের সর্বজনীন রোবটরা')। 'রসুমের সর্বজনীন রোবটরা'র প্রথম প্রিমিয়ার শো হয় ১৯২১ সালের ২৫ জানুয়ারি, চেক ভাষায় মঞ্চায়ন হলেও কিন্তু ইংরেজি সাবটাইটেল ব্যবহার হয়েছিল। তাই 'রসুমের সর্বজনীন রোবটরা' ইংরেজিতে হয় 'রোসাম'স ইউনির্ভাসাল রোবটস' (আর.ইউ.আর)। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে 'আরইউআর' -এর সফল মঞ্চায়ন হয়, কারেল চাপেক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক নাট্যকারে পরিণত হন। সেই থেকে 'রোবট' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় এবং বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। 'আরইউআর' দ্রুত এতটাই জনপ্রিয় হয় যে ১৯২৩ সালের মধ্যে পৃথিবীর ত্রিশটি ভাষায় অনূদিত হয়। ভাবা যায়? (বাংলায় হয়ত অনূদিত হয়নি, নাকি হয়েছে!)!

কারেল চাপেক কে ছিলেন

এক কথায় কারেল চাপেকের পরিচয় দেওয়া সহজ কাজ নয়। তাঁর জন্ম ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখে চেক প্রজাতন্ত্রের ত্রুতনভ নামক শহরে। পেশাগত জীবনে সাংবাদিক ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর লেখনি প্রতিভার শিকড় ছিল বহুধা বিস্তৃত। নাটক লিখেছেন (নাট্যসাহিত্য, পরিবেশনা, পরিচালনা, মঞ্চায়ন) ছোটোগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। ছিলেন প্রাবন্ধিক, লাইব্রেরি রিভ'য়ার, ফটোগ্রাফার, আর্ট ক্রিটিক, রাজনৈতিক রচনা লেখা ইত্যাদি হরেক শাখায় অনায়াসে বিচরণ করেছেন। ছিলেন তো সব্যসাচী লেখক।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য কম করে সাত সাতবার তিনি মনোনয়ন পেয়েছিলেন, তবে পুরস্কারটি পাওয়া হয়নি তাঁর। তাঁর নামে একাধিক পুরস্কার চালু রয়েছে, যেমন : প্রতিবছর চেক পেন ক্লাব প্রদত্ত কারেল চাপেক পুরস্কার। স্বয়ং চাপেক ছিলেন আন্তর্জাতিক পেন ক্লাবের সদস্য এবং চেকোস্লোভাক পেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্টও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চাপেকের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার প্রাগে আসেন কারেল চাপেকের আমন্ত্রণে, পেন ক্লাবের অতিথি হয়ে। প্রাগে ছিলেন প্রায় সপ্তাহ খানেকের মতো। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিনি পড়াশুনা করেন প্রাগে অবস্থিত চার্লস বিশ্ববিদ্যালয় (ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি) বার্লিনের ফ্রিডরিষ ভিলহেলম বিশ্ববিদ্যালয় ও প্যারিসের সরোবন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কারেল চাপেকরা ছিলেন দুই ভাই ও এক বোন। তিন ভাইবোনের মধ্যে কারেল ছিলেন সবার ছোটো, আর সবার বড়ো ছিলেন ভাই জোসেফ চাপেক, দুই ভাইয়ের মাঝখানে বোন হেলেনা। বড়োভাই জোসেফ ছিলেন সফল শিল্পী-চিত্রকর এবং বইয়ের সচিত্রীকারক/অলংকারক বা 'ইলাস্ট্রেটার'। দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কটি ছিল অত্যন্ত গভীর, কর্মজীবনের সবটা সময় তাঁরা প্রাগের 'ভিনোহ্রাদি'র সুন্দর চমৎকার ভিলাতে-'একান্ন পরিবারের' মতো বসবাস করেছেন, একত্রে দুই ভাই অনেক কাজ করেছেন। যেমন: যে 'আর.ইউ.আর' কারেল'কে বিশ্ব সাহিত্যের প্রবেশ-টিকেট এনে দেয়, তার মূল চরিত্র 'রোবট' শব্দটির জন্মদাতা ছিলেন ভাই জোসেফ। আবার কারেল যখন 'নারোদনী লিস্টি'র ('জাতীয় পত্রিকা') সম্পাদক ছিলেন জোসেফও ঐ একই পত্রিকায় কাজ করেছেন। ১৯২১ সালে দুই ভাই 'নারোদনী লিস্টি'র চাকরি ছেড়ে দেন ও 'স্টাফ' হিসেবে যোগদান করেন 'লিডোভে নভিনি' ('জনগণের পত্রিকা') নামক পত্রিকায় (অনেক হাত ঘুরে পত্রিকাটির মালিকানা বদলেছে বটে তবে পত্রিকাটি এখনো প্রকাশিত হচ্ছে)। তাঁদের বোন হেলেনা চৌকশ পিয়ানাবাদক ছিলেন, তবে পরে লেখকে পরিণত হন এবং দুই ভাইয়ের বিষয়ে কয়েকটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন।

'আরইউআর' প্রসঙ্গে কিছু কথা

নাটকের দৃশ্যপট একটি কারখানা, এখানে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে সৃষ্ট জৈব বস্তু দিয়ে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করা হয়। এরাই হলো চাপেকের 'রোবতি' বা রোবট, তবে দেখতে তারা রক্ত-মাংসের সমাহারে সৃষ্ট প্রাণীর মতো -যন্ত্রপাতি, কলকব্জা কোনো কিছু নয়। এই রোবটরা দেখতে মানুষের মতোই এবং নিজেদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেও (প্রায়) সক্ষম। প্রথমদিকে তারা মানুষের জন্য কাজ করে, আর করতে পারছে বলে তারা আনন্দিত বলেও মনে হয়। কিন্তু সেই সুখ ও আনন্দ চিরস্থায়ী হতে আসেনি - শিগগিরই রোবট-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়, শেষতক রোবটের বিজয় ও মানবজাতির বিলুপ্তির মাধ্যমে রোবট-বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে। বিশ্ব এখন রোবটাধিকারে, রোবটদের বিশ্ব, কিন্তু হলে কি হবে? তারা নিজেরা তো নিজেদের বানিয়ে বানিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে জানে না? রোবটদের এই অক্ষমতাই আমাদের তথা মানবজাতির জন্য সৌভাগ্যের আলোকবর্তিকা। কারণ চাপেকের রোবটরা যত স্মার্টই হোক না কেন তারা প্রকৃতি প্রদত্ত মানুষ ও মানুষের দক্ষতা ও সক্ষতার একশভাগ গুণাবলি অর্জন করতে পারেনি। কাজেই 'আশা'র মৃত্যু হয়নি, শেষ আশার ইশারা রয়েছে একটি - মানবজাতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নয় কি?

আর.ইউ.আর ছিল চাপেকের প্রথম নাটক। একই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি যে দ্বিতীয় নাটক লেখেন - 'ভালকা স্ ম্লকি' (বাংলায় 'গোসাপের/গোধিকার সঙ্গে যুদ্ধ'), ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে 'ওয়ার উইথ দি নিউটস' -সেখানে কিন্তু অ-মানুষরা মানব সমাজের ভৃত্যশ্রেণি রূপে মানুষের সেবার্কম করে।

কারেল চাপেকের রোবট ছিল অন্য ধরনের। কারণ, আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী রোবট হলো মেশিন, স্মার্ট যন্ত্র -তার চলাফেরা, কাজর্কম করতে 'সফটওয়্যার' লাগে। কি ধরনের কাজর্কম সে করবে সেগুলো 'সফট ওয়্যারে'র মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়। আর তাকে'রিমোট কন্ট্রোলে'র সাহায্যে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যায় আবার ওর 'শরীরের' মধ্যেই কখনোবা স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা তৈরি করে দেওয়া হয়। রোবট স্বয়ংক্রিয় হতে পারে, আবার আধা-স্বয়ংক্রিয়ও হতে পারে। আমরা রোবট বানাই - যাতে ওকে দিয়ে আমাদের কাজগুলো করিয়ে নিতে পারি। তাই সে দেখতে কেমন হবে এর কোনো প্রাধান্য নেই। দেখতে তাই আমাদের মতোও যেমন হতে পারে, আবার 'ড্রোন' নামে পরিচিত চালকবিহীন ছোট্ট বিমানও হতে পারে। আবার কলকারখানার প্রয়োজনে বানানো রোবটরা দেখতে যেমন হবে- অতি ক্ষুদ্র ন্যানো-রোবটের চেহারাপত্র হবে ভিন্ন রকমের, তাই নয় কি? যেমন : যে কারখানায় অতি উচ্চতাপে লোহা বা কাঁচ গলানো হয়, অর্থাৎ ঢালাইখানার কাজ করতে যে ধরনের রোবট ব্যবহার হচ্ছে- তারা নিশ্চয় ফুকুশিমার দুর্ঘটনাগ্রস্ত পারমাণবিক চুল্লির কাজে নিয়োজিত রোবটদের থেকে ভিন্নতর হবে, বা ইদানিংকালে যেমন সামরিক গুদামখানা ও সংরক্ষিত এলাকার পাহারাদারদের জন্য রোবট ব্যবহার হচ্ছে, তারাও র্কমভেদে ভিন্নতর হবে। এরকম অনেক অনেক উদাহরণ রয়েছে।

রোবটের ডিজাইন, নির্মাণকৌশল, পরিচালনা ও অপারেশন, প্রয়োগ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো যে প্রযুক্তির অন্তর্গত তাকে বলা হয় রোবটিক্স।

সবকিছুর যেমন ইতিহাস থাকে - রোবটদেরও তেমনি রয়েছে রোবট-ইতিহাস! আর কি আর্শ্চয যে বয়সের বিচারে রোবট-ইতিহাস আমাদের সভ্যতার সমবয়সী। সত্যি বটে যে 'রোবট' শব্দটির জন্ম ১৯২০ সালে, কিন্তু পোশাকী নামকরণটি হওয়ার অ-নে-ক অ-নে-ক আগে থেকেই মানুষ 'রোবট' বানানোর স্বপ্ন দেখেছে, বানানোর চেষ্টা করেছে, বানিয়েছে। আসলে সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করলে, দেখব যে পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতা, যেমন : প্রাচীন চীন, গ্রীক, রোমক, ইত্যাদি সভ্যতাগুলো, বা এমনকি ইহুদি উপাখ্যানের 'গোলেম', বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের জন্য সম্রাট অশোকের 'যান্ত্রিক রোবট' ব্যবহারের প্রয়াস ইত্যাদি। দীর্ঘ এই ইতিহাস! আমরা তার বিস্তৃত বর্ণনায় যাব না।

রোবট বনাম বায়োনিক্স

কারেল চাপেকের রোবটের সঙ্গে র্কমক্ষম 'আধুনিক' রোবটের কোনো মিল নেই, নামটি ছাড়া। তবে চাপেকের 'আরইউআর' এবং আমাদের আধুনিক রোবটের মাঝামাঝি কোনো এক স্থানে/বিন্দুতে আমরা যদি 'বায়োনিক্স' নামক নতুন একটি প্রয়োগবিধিকে ঢোকাতে পারি তো কেমন হয়? 'বায়োনিক্সে'র আর্কষণীয় আর্কষণ হলো যে - এখানে প্রকৌশলগত সিস্টেম ও আধুনিক প্রযুক্তিকে প্রকৃতিগত জৈব পদ্ধতি ও সিস্টেমের সঙ্গে মিলেমিশে ব্যবহারোপযোগী করা যায় কিনা!

'বায়োনিক' শব্দটির সৃষ্টি ১৯৫৮ সালে, কৃতিত্ব জ্যাক ই. স্টিল'কে দেওয়া হয় (স্টিল ছিলেন মার্কিন বিমানবাহিনির ডাক্তার)। প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'বী-ওন থেকে

'আরইউআর'-এর একটি দৃশ্য। ডানদিকে দণ্ডায়মান তিন রোবট

হয়ত শব্দটি তৈরি হয়েছে; অর্থ : জীবন সদৃশ (লাইক লাইফ)। অবশ্য কেউ যদি বলে : 'বায়োলজি'র (জীববিজ্ঞান) 'বায়ো' এবং 'ইলেকট্রনিক্সে'-এর 'নিক্স' যুক্ত হয়ে-হয়েছে 'বায়োনিক্স', সেটিকেও বোধ করি মাথা নেড়ে নাকচ করা যায় না। তবে 'বায়োনিক্স' শব্দের জন্মরহস্য আমাদের সমস্যা নয়। বায়োনিক্স-ও কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির রাজ্যে স্থান করে নিয়েছে।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ টিভিতে 'সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান' নামে একটি সায়েন্স-ফিকশন সিরিজ দেখাতো। আমার মতো অনেকেই সিরিজটি 'মিস' করার কথা ভাবতেই পারত না। 'সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান' ছিল - বিজ্ঞান, অ্যাকশন, রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ড, ক্রাইম, ড্রামা, গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে পরিপাটি একটি সায়েন্স-ফিকশন। 'সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান' শেষ হতে না হতেই দেখানো হয় 'বায়োনিক ওম্যান' নামে একই মেজাজের আরেকটি সায়েন্স-ফিকশন সিরিজ।

'সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানে'র প্রোটাগনিস্ট ছিল নাসা'র (মার্কিন জাতীয় বিমানচালনবিদ্যা ও মহাশূন্য সংস্থা) একজন প্রাক্তন নভোচারি, নাম কর্নেল স্টিভ অস্টিন। 'ফিক্সড-উইং' বিমানের পরীক্ষামূলক উড্ডয়নকালে দুর্ঘটনা ঘটলে কর্নেল স্টিভ মারাত্মকভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনায় তার ডানহাতের বাহু, দুই পা এবং বাঁ চোখটি খোয়া যায়। তাই সার্জারি করে শরীরের খোয়া যাওয়া অঙ্গগুলোকে 'বায়োনিক' প্রোথিতকরণ বা 'ইমপ্ল্যান্টেশন' করে স্টিভকে পুনর্নির্মিত করা হয়। খরচ হয় ছয় মিলিয়ন ডলার।

এভাবে বিভিন্ন যান্ত্রিক অংশ দিয়ে পুনর্নির্মিত মানুষ স্টিভ 'সাইবারনেটিক অস্তিত্ব' রূপে আবির্ভূত হয়। সুস্থ হয়ে ওঠার পরে দেখা যায় যে তার শরীরে প্রোথিত যান্ত্রিক অংশগুলো তার গায়ের শক্তি, গতি এবং দৃষ্টিশক্তি -তিনটিই ভীষণভাবে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। যেমন : সে ঘন্টা প্রতি সাতানব্বই কিলোমিটার বেগে দৌড়ায়, জুম লেন্সের হিসেবে চোখের দৃষ্টিশক্তি যেমন কুড়ি টু এক আবার সেইসঙ্গে পায় অবলোহিতের (ইনফ্রারেড) দক্ষতা - যার অর্থ রাতের অন্ধকারেও দেখতে পারে সে এবং স্টিভের দুই বায়োনিক পায়ের ক্ষমতা হয় 'বুলডোজারে'র সমপরিমাণের। অর্থাৎ বায়োনিক 'হার্ডওয়্যারের' বদৌলতে স্টিভ 'সুপারম্যান' বনে যায়।

কিন্তু এভাবে তৈরিকৃত সুপারম্যান যা খুশি তাই করতে পারে না কি? পারতে পারে বই কি!। তাই - যদি কখনো 'বায়োনিক' মানুষ তৈরি হয় তবে কি তার আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু স্ট্যান্ডার্ড নিয়মবিধি থাকা উচিত নয়?

অবশ্যই যে উচিত-সে বিষয়ে দ্বিমত নেই কোনো। তাই-আমরা দর্শকরা 'সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানে'র স্টিভকে এবং 'বায়োনিক ওম্যানে'র প্রোটাগনিস্ট (প্রাক্তন টেনিস প্লেয়ার) জেমি সোমারসকে সর্বোচ্চ দুই তলা পর্যন্ত লাফিয়ে উঠতে দেখেছি এবং লাফিয়ে নিচে নামার সময়-এই দুই 'সুপারম্যান' তিন তলার বেশি যে পারত না, সেটিও দেখেছি আমরা। তাছাড়াও, তাদের বায়োনিক দক্ষতার দৌড় কতোটুকু সম্বন্ধে স্টিভ বা জেমি সোমারস যে ওয়াকেবহাল ছিল না-বিভিন্ন দৃশ্যে দর্শকদের বলে দেওয়া হয়েছে।

সে যাহোক, সুস্থ হওয়ার পরে স্টিভ তার বায়োনিক দক্ষতাকে স্বদেশের জন্য নিয়োজিত করতে মনস্থ করে। তাই সে অসি বা 'অফিস অব দি সায়েন্টিফিক ইনটেলিজেন্সে'র (কাল্পনিক সংস্থা) সিক্রেট এজেন্ট হয়। বায়োনিক ওয়্যাম্যানে আমরা দেখি যে স্টিভের সুপারিশে জেমি'ও অসি'র সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

স্পেস স্পেস

চেক শব্দ 'রোবতা' থেকে কারেল চাপেকের 'রোবট' শব্দের সৃষ্টি, 'রোবতা'র অর্থ - জবরদস্তি শ্রম, তথা শ্রমসাধ্য কিন্তু কম মজুরির কাজ। অবশ্য প্রচুর কাজ থাকলে এবং সময়মতো সেই কাজ শেষ করার প্রচণ্ড চাপ থাকলে, তাকেও (কথ্য ভাষায়) কখনো বা 'রোবতা' বলা হয়।

'রোবতা' থেকে আসে 'রোবট' এবং রোবটের রেশ ধরে আমরা পাই 'বায়োনিক্স', সাইবারনেটিক্স, সাইবারনেটিক অর্গানিজম (বা সাইবর্গ), বায়োরোবটিক্স, এমনকি জেনেটিক ইনঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি হরেক পরিভাষা। পরিভাষাগুলোর অর্থগত বিভিন্নতা রয়েছে বটে তবে তারা আংশিকভাবে বা কোনো না কোনোভাবে কিন্তু সম্পর্কযুক্ত।

আবার কারেল চাপেক

সাংবাদিক, সব্যসাচী লেখক কারেল চাপেকের প্রবৃদ্ধির প্রায় সবটুকু সময় কেটেছে মহাযুদ্ধ প্রস্তুতির হিংস্র সময়ে ও কালে। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু ১৯১৪ সালে, সমাপ্তি ১৯১৮ সালে। এই সময়ের মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটে। ১. ১৯১৫ সালে তরুণ চাপেক দর্শনশাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেন। মেরুদণ্ডের 'ক্রনিক' অসুখের কারণে তাঁকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়নি। ২. যুদ্ধশেষে, ১৯১৮ সালে সাবেক অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের অংশ চেকোস্লোভাকিয়ার আর্বিভাব ঘটে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট তমাশ গেরিক মাসারিকের সঙ্গে তাঁর সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ লেখেন 'টকস উইথ টি.জি মাসারিক' নামক প্রেসিডেন্ট মাসারিকের জীবনী।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির প্রায় অব্যবহিত পর পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। জার্মানিতে নাৎসীবাদ এবং ইতালিতে ফ্যাসিবাদ ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। সঙ্গত কারণেই কারেল চাপেক ছিলেন নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের কট্টর বিরোধী। এবং এমনকি তিনি উভয় 'বাদ'কে 'যুক্তিক্ষমহীনতা' বলতে দ্বিধা করেননি। এই স্পষ্টবাদীতার জন্য চাপেক'কে কিছু মূল্য দিতে হয়েছে অবশ্য। সাত সাতবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মনোনয়ন পান বটে কিন্তু সুইডেনে অবস্থিত নোবেল পুরস্কার কমিটি হিটলারের ভয়ে চাপেককে পুরস্কারটি দিতে সাহস পায়নি।

উপরোক্ত কারণে চাপেক মনোভঙ্গ হয়েছিলেন কিনা-এর প্রমাণাদি স্বরূপ কোনো উক্তি আমরা শুনিনি কিন্তু। তবে 'মিউনিখ চুক্তি' কারেল চাপেককে শতভাগে ক্ষতবিক্ষত করেছিল, আত্মশ্লাঘা, অসহায়ত্ব, নিরুপায়হীনতায় নিরন্তর ছিন্নভিন্ন হতে থাকেন চাপেক। নাৎসী ও ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতার ওপরে প্রচুর লেখেন তিনি। রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে, ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে চাপেক রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইনসহ অনেকের কাছে প্রাগ রেডিও-র মাধ্যমে শান্তি ও শুভউইল বাণী সম্প্রচার করেছিলেন। বিশ্বভারতীতে বসে রবীন্দ্রনাথ সেই বাণী শোনার পরে টেলিগ্রামের মাধ্যমে সুন্দর একটি উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি লেখেন ও তার ইংরেজি অনুবাদটি প্রাগে পাঠিয়ে দেন।

দুই চাপেকের মৃত্যু

বলাইবাহুল্য যে দুই চাপেক ভাই - জোসেফ ও কারেল গেস্টাপো'র গ্রেফতারি তালিকায় ছিলেন, ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে চেকোস্লোভাকিয়াকে জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তির পরে তাঁদের গ্রেফতারি ছিল অনিবার্য। তাই ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে তাঁদেরকে দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার পরার্মশ দেওয়া হয়। চেকোস্লোভাকদের দুর্দশার জন্য যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স দায়ী তাদেরই একটিতে 'নির্বাসনে' চলে যাওয়ার পরার্মশ দুই ভাইই বাতিল করে দেন। তাঁরা প্রাগে থেকে যান। অবশ্য গেস্টাপোর দল কারেল চাপেককে কোনোদিনই ধরতে পারেনি। ১৯৩৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। গেস্টাপোরা বড়োভাই জোসেফকে গ্রেফতার করে ও কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি করে রাখে, ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কারেল চাপেকের আরেকটি কৃতিত্ব

কারেল চাপেকের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি 'স্পেকুলেটিভ সায়েন্স ফিকশন' নামক নতুন শাখা বা 'জেনর'-এর জন্ম দেয়। তাঁর বয়োকনিষ্ঠ অ্যালডুস হাক্সলী, জর্জ ওরওয়েল এই 'জেনরে'র অর্ন্তভুক্ত এবং রে ব্র্যাডবেরি, সালমন রুশদি, ডান সায়মনস, ব্রায়ান অলডিস ইত্যাদি লেখকরা কারেল চাপেকের উত্তরসূরি।

রোবোটিক নিবন্ধ

রবিবট ও নওরিন

আহমেদ রিয়াজ

টিং টং! টিং টং!

কলিং বেলের শব্দ। কলিং বেলের শব্দ পেলেই ছুটে যায় নওরিন। ভেতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, কে?

আজও চেঁচালো, কে?

আমি রে নওরিন। তোমার রবি মামা।

রবি মামা! খুট করে দরজার ছিটকিনি খুলে দেয় নওরিন। ছিটকিনি খোলার শব্দ পেয়েই রান্নাঘর থেকে হাঁক ছাড়েন মা, কে এসেছে রে নওরিন?

জবাবটা রবি মামাই দিয়ে দেন, বুবু আমি রবি।

রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন মা। আরে! রবি। এতদিন পর! একা এসেছিস?

রবি মামা মুচকি হাসলেন। বললেন, একা নই বুবু। আরেকজন আছে।

বলতে না বলতেই মামার পিছন থেকে সে উঁকি দিল। আর তাকে দেখেই আঁতকে উঠলেন মা। চেঁচিয়ে উঠলেন, ওটা কে?

এবার জবাবটা দিল নওরিন, আরে! মামা! ও কি রোবট?

মামা বললেন, হুঁ। রোবট। আমি বানিয়েছি। ঐতিহাসিক রোবট।

হঠাৎ এগিয়ে এল রোবটটা। নওরিনের সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, হাই নওরিন। আমি রবিবট।

এবার অবাক নওরিন। চোখ দুটো কপালে তুলে দিয়ে বলল, রবিবট! ওটা আবার কী?

মামা বললেন, রোবটটা আমি বানিয়েছি কি না। তাই নিজের নামেই ওটার নাম রাখলাম। রবিবট। রবির রবি আর রোবটের বট। দুইয়ে মিলে রবিবট।

মায়ের সঙ্গে সুখ-দুঃখের আলাপ জুড়ে দিলেন রবি মামা। নওরিন আর কী করে! রবিবটের সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে ফেলল। রবিবট বলল, জানো তো আমি ইতিহাসবিদ।

মানে?

মানে ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি আমি।

নওরিন এবার একটা প্রশ্ন করল, বলো তো পম্পেই নগরি কত সালে ধ্বংস হয়?

রবিবট চুপ।

নওরিন তাড়া দিল, বলো? নাকি জানো না।

রবিবট এবারো চুপ।

মামা দূর থেকে নওরিনের প্রশ্ন শুনতে পেয়েছেন। বললেন, তুমি ওকে রোবট নিয়ে প্রশ্ন করো। ও ঠিক ঠিক জবাব দেবে। ও হচ্ছে রোবট বিষয়ক ইতিহাসবিদ।

বাহ্। রোবট নিয়ে অনেক কিছু জানতে চায় নওরিন। কারো কাছ থেকে মনের মতো জবাব পায়নি। অনেকেই বলেছে জেনে বলব। ওই বলা পর্যন্তই। কেউ আর জবাব দেয়নি। ধুম করে প্রশ্নটা করে বসল নওরিন, আচ্ছা রবিবট, রোবট নামটা এল কী করে?

এটা তো সবাই জানে। চেক নাট্যকার কারেল চাপেকের নাটক থেকে। ঘটনাটা ১৯২১ সালের।

নওরিন বলল, তাহলে রোবটের ইতিহাস খুব বেশিদিন আগের নয়?

তা নয়। রোবটের ইতিহাস দুই হাজার বছরেরও পুরনো।

তাই নাকি!

আবারো নওরিনের চোখ কপালে। জানতে চাইল, কী রকম?

বলতে শুরু করল রবিবট।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০ থেকে ৪০০ বছর আগের কথা। গ্রিস দেশের এক নামি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিল। নাম তার আরচিতাস। এই আরচিতাসকে বলা হয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের জনক। কাঠ দিয়ে একটা পাখি বানালেন আরচিতাস। আর কাঠের পাখিটার নড়াচড়ার জন্য এতে জুড়ে দিলেন বাষ্পশক্তি। ব্যস। এটা বাষ্পশক্তিতে ২০০ মিটার পর্যন্ত উড়তে পারত। ওটাই কিন্তু প্রথম রোবট নয়। এর আগেও রোবট আবিষ্কৃত হয়েছে। ওটা ছিল প্রথম রেকর্ড করা রোবটের কথা। গ্রিকরা তখন চলমান মূর্তিও আবিষ্কার করেছিল। ওই মূর্তিগুলো মন্দিরের দরজা খুলতে পারত। মন্দিরে আসা অতিথিদের পানিও দিতে পারত।

১৭৭০ সালে পিয়েরে জেকুয়েত নামে এক ঘড়ি নির্মাতা তিনটা মেশিন আবিষ্কার করেছিলেন। এদের একটি মেশিন লিখতে পারত, একটি ছবি আঁকতে পারত আর তৃতীয়টি গান গাইতে পারত। আর ওই পুতুলগুলো কাজ করত পুলি, গিয়ার ও স্প্রিং ব্যবহার করে। তবে ওই পুতুলগুলো তৈরি করা হয়েছিল রাজ দরবারের সদস্যদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। সেগুলোও কিন্তু রোবট ছিল।

ওদিকে ১৮৯৮ সালে নিকোলাস তেসলা নামে এক বিজ্ঞানী একটি সাবমেরিন বানান। সেটি রেডিও দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেত। আবিষ্কারটি বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল তখন। তারপর ১৯২১ সালের ঘটনা তো অনেকেই জানে। চেক নাট্যকারের নাটকে রোবট শব্দটি প্রথম আসে। এ কারণেই রোবট হচ্ছে চেক শব্দ। রোবট অর্থ শ্রমিক। এর ১২ বছর পর সত্যিকারের রোবট বানালো জাপান। আকৃতিতে ছিল খুবই ছোটো। মাত্র ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা। নাম দেওয়া হলো লিলিপুট। ওটা কেবল হাঁটতে পারত। তারপর...

নাহ্। শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে গেছে নওরিন। মানুষ হলে বলতে বলতে হাঁপাতো। মুখের সঙ্গে কানেরও খানিক দম নেওয়া দরকার। নওরিন আবার জানতে চাইল, শুনেছি রোবটের নাকি আবার আইনকানুন আছে? মানে নিয়মনীতি আর কী!

আগের কথার খেই ধরেই আবার শুরু করল রবিবট–

তারপর ১৯৪১ সালে দুনিয়া বিখ্যাত একটি গল্প লিখলেন এক বিখ্যাত লেখক। নাম তার আইজাক আসিমভ। রাশিয়ান এই লেখক ছিলেন জৈব বিজ্ঞানী। তবে থাকতেন যুক্তরাষ্ট্রে। কল্পবিজ্ঞানের রাজা বলা হয় তাঁকে। তো ১৯৪২ সালে লেখা তাঁর গল্পের নাম লায়ার। এই গল্পে তিনি রোবটদের তিনটি মূলনীতি দিয়েছিলেন। সেই তিন মূলনীতি হচ্ছে– ১. একটি রোবট কখনোই কোনো মানুষকে আহত করবে না। এমনকি মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন কাজও করবে না। ২. একটি রোবট সব সময়ই মানুষের দেওয়া যে-কোনো আদেশ মানবে। শুধুমাত্র যদি সেটা প্রথম মূলনীতির সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ না হয়। যদি কোনো মানুষ এমন কোনো আদেশ দেয়, যেটা অন্য কোনো মানুষের জন্য বা সমগ্র মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর, তাহলে রোবট অবশ্যই সে আদেশ মানবে না। ৩. একটি রোবট অবশ্যই নিজেকে রক্ষা করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা প্রথম দুটো মূলনীতির

সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ না হয়। মানে মানুষের ক্ষতি না করে এবং মানুষের আদেশ অনুসরণ করে সে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলবে।

শুধু আইজ্যাক আসিমভ নন, তিন রোবটিক সূত্র দিয়েছেন আরো অনেকে। জাঙ্কবুটস, বাগবুটস এবং বুটস অন হুইলস নামে একটি বই লেখা হয়েছে। বইটির লেখক দুজন— ডেভ রিগুকিও এবং মার্ক টিলডেন। ২০০২ সালে বইটি প্রকাশ করে লস অ্যালমস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি। বইতে আধুনিক প্রযুক্তির রোবট সম্পর্কিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ওই বইতে রোবটের তিন সূত্র জানিয়েছেন টিলডেন ১. যে-কোনো মূল্যে রোবট তার অস্তিত্ব রক্ষা করবে, ২. যে-কোনো রোবট তার শক্তির উৎসকে মেনে চলবে ও তার অধীনে থাকবে ৩. যে-কোনো রোবট প্রতিনিয়ত আরো শক্তিশালী কোনো উৎসের খোঁজ করবে।

তখনই চট করে প্রশ্ন করল নওরিন, কিন্তু যেভাবে রোবট নিয়ে গবেষণা চলছে, রোবটরা এক সময় মানুষের মতো বুদ্ধিমান হবে। মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে। তখন রোবট আর মানুষ আলাদা করার উপায় কী?

রবিবট বলল, সেটা নিয়ে ভাবলেন অ্যালান ম্যাথিসন টুরিং। ১৯৫০ সালে এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এমন একটি পরীক্ষার প্রস্তাব করলেন, যেটার মাধ্যমে সহজেই বোঝা যাবে, তুমি যার সঙ্গে কথা বলছ সেটা মানুষ নাকি রোবট। এর নাম টুরিং টেস্ট।

১৯৫৪ সালে দুনিয়ার প্রথম প্রোগ্রামেবল রোবট তৈরি করলেন জর্জ ডেভল ও জো অ্যাঙ্গেলবার্গ। নাম দেওয়া হলো আর্ম। জেনারেল মোটরসের কারখানায় মানুষের বিকল্প হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ শুরু করল আর্ম। রোবট নামের সার্থকতা শুরু বুঝি এই আর্ম দিয়ে। শ্রমিক হিসেবে দুনিয়ার নানান কারখানায় কাজ শুরু করল রোবট। রোবট নামের আগে শ্রমিক বলার কিন্তু দরকার নেই। কারণ রোবট মানেই তো শ্রমিক। ১৯৯৪ সালে কার্নেগি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করল আট পায়ের এক রোবট। নাম দেওয়া হলো দান্তে টু। আগ্নেয়গিরির ভিতর থেকে গ্যাসের নমুনা সংগ্রহ করে আনল দান্তে টু। ১৯৯৭ সালে ডিপ ব্লু নামে এক রোবট তো দুনিয়ায় রীতিমতো হইচই ফেলে দিল। দাবাড়ু ওই রোবট কিন্তু দাবা খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল তখনকার দুনিয়ার সেরা দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভকে। ওই বছরই জাপানে শুরু হলো রোবোকাপ টুর্নামেন্ট। জাপানিজদের লক্ষ্য অবশ্য ২০৫০ সাল। ২০৫০ সালে রোবটদের নিয়ে এমন একটা ফুটবল দল বানাতে চায় জাপান, যে দল হারিয়ে দেবে পৃথিবীর সেরা ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দলকে।

এই জাপানিজরা ১৯৯৯ সালে বানালো আইবো নামে এক কুকুর রোবট। এই রোবট মালিকের সঙ্গে কুকুরের মতো আচরণ করতে পারে। এরপর থেকে দুনিয়ার নানা জায়গায় তৈরি হতে লাগল নানা ধরনের রোবট।

নিবন্ধ

সায়েন্স ফিকশনের যন্ত্রমানব

শামস সাইদ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে রোবট অনেক সহজ করে দিয়েছে। রোবটের সাহায্যে বর্তমান বিশ্বে আমরা অনেক কিছুই করে থাকি। এর একটা খারাপ দিকও আছে। তবে খারাপের চেয়ে ভালো দিকই বেশি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে খুনি রোবটের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়েছে প্রযুক্তি জগতের নামকরা ব্যক্তিত্বরা এবং বিজ্ঞানীরা।

রোবট শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সায়েন্স ফিকশনের সেই যন্ত্রমানবের কাল্পনিক চেহারা কিংবা সাই-ফাই ম্যুভির কোনো এক যন্ত্রদানবের চেহারা। রোবট নিয়ে সায়েন্স ফিকশন আর গল্প হাতের কাছে পেলেই ঝটপট করে পড়ে ফেলতে মন চায়। রোবট নিয়ে কোনো ম্যুভি হলে আর কথা নাই, সেটা শেষ না করে ওঠাই যাবে না। কিন্তু রোবট, এর ইতিহাস আমাদের অনেকেরই অজানা? কে প্রথম রোবট তৈরির কথা বলেছিলেন, 'রোবট' শব্দটাই বা এল কোত্থেকে, অথবা কীভাবেই বা রোবট তৈরির প্রযুক্তি আজকের পর্যায়ে এল, এসব প্রশ্ন অনেকের মনেই রয়েছে।

বর্তমান সময়ে যে ধরনের ব্যবহার হতে লাগল রোবট নানান কাজে। ২০০৪ সালে এপসন কোম্পানি তৈরি করল ছোট্ট একটা রোবট। লম্বা মাত্র সাত সেন্টিমিটার। ওজন মাত্র ১০ গ্রাম। হেলিকপ্টার আকৃতির এই উড়ুক্কু রোবট আসলে একটা ক্যামেরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কাজে লাগানোর জন্যই ওই রোবটের সৃষ্টি হয়। ২০০৫ সালে আশ্চর্য এক রোবট তৈরি করল কর্নেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। অনেকগুলো ছোটো ছোটো কিউব দিয়ে তৈরি এই রোবট চুম্বকের মাধ্যমে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। রোবটটি প্রয়োজন অনুযায়ী নানান আকৃতি নিতে পারে। এর আগে ২০০২ সালে তৈরি হয়েছিল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রোবট। মাত্র ছয় বছরে পঁচিশ লাখেরও বেশি ওই রোবট বিক্রি হয়।

হঠাৎ থেমে গেল রবিবট। হুঁ। ওই তো রবি মামা উঠে আসছেন। কখন যে মামাকে চা-নাশতা দিয়েছেন মা, টেরই পায়নি নওরিন। রবি মামা বললেন, চলো হে রবিবট। অনেক বেড়ানো হয়েছে। এবার মন ভালো হয়েছে তো!

নওরিন অবাক হয়ে দেখল, সামান্য মাথা নোয়ালো রবিবট। তার মানে রবিবটেরও মন খারাপ হয়! তাহলে কী ভবিষ্যতের রোবট আরো মানবিক গুণ নিয়ে তৈরি হবে! যদিও এখন পর্যন্ত মানবিক গুণসমৃদ্ধ রোবট আবিষ্কৃত হয়নি। তবে যে ধরনের মানবিকতা রোবটের মধ্যে দেখা যায় এখন, তার সবই কৃত্রিম। এখনো সত্যিকারের আবেগ রোবটে প্রবেশ করেনি। কিংবা বলা যায়, বিজ্ঞানীরা মানবিক আবেগসমৃদ্ধ রোবট এখনো উদ্ভাবন করতে পারেননি। ভবিষ্যতে কী পারবেন?

ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা কী পারবেন আর কী পারবেন না, সেটা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তবে রোবট যে মানুষের সঙ্গীও হতে চলেছে কয়েক বছরের মধ্যে, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। দিন দিন রোবট প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নানান রকম কর্মী রোবট। হয়ত পক্ষপাতিত্বমূলক কাজের জায়গাগুলো এক সময় দখল করবে রোবট। হয়ত দেখা যাবে মাঠে ফুটবল খেলা পরিচালনা করছে কোনো রেফারি রোবট। কিংবা ক্রিকেট মাঠে আম্পায়ার হিসেবে দেখা যাবে কোনো রোবটকে। যে হারে দিন দিন উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে— সেদিন সম্ভবত খুব একটা বেশি দূরে নয়।

রোবট পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, প্রথম দিকের রোবটগুলো কিন্তু মোটেও তেমন ছিল না। বিবর্তনের ধারায় রোবটের গঠনে পরিবর্তন এসেছে অনেক।

রোবটদের ইতিহাসের শুরু কিন্তু অনেক অনেক দিন আগে। আমরা যে ইংরেজি সনের কথা জানি তখনো সেই সন গণনা শুরু হয়নি। রোবটদের ইতিহাসের শুরু অনেক আগেই। পৃথিবীর সেরা দার্শনিকদের অন্যতম অ্যারিস্টটল। তিনি সেই সময়ই বলেছিলেন, যদি সব যন্ত্র আদেশ দিলেই কাজ করত, কিংবা নিজে নিজেই তা করতে পারত যা ঐ যন্ত্রের করার কথা! তাহলে আর কাউকে শিক্ষানবীশ হতে হতো না, কাউকে দাসও থাকতে হতো না। যে যন্ত্র নিজে নিজেই কাজ করতে পারে, তাকেই আমরা রোবট বলি। আমরা বর্তমানে যে রোবটের জয়জয়কার দেখি সেই রোবটের কথা আজ থেকে প্রায় পঁচিশ শত বছর আগে চিন্তা করেছিলেন অ্যারিস্টটল! বিশ্বের প্রথম রোবটটি তৈরি হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ৩৫০ সালের মধ্যে। এ রোবটটি ছিল বাষ্প শক্তির সাহায্যে চলা এবং রোবটটি তৈরি করেছিলেন গ্রিক গণিতবিদ আরকিটাস।

এরপর প্রায় দেড় হাজার বছর রোবট নিয়ে আর কোনো কাজই হয়নি। হবে কীভাবে, চিন্তা করলেই তো আর একটি রোবট তৈরি হয়ে যায় না। রোবট তৈরি করতে লাগে প্রতিভাবান মানুষ, লাগে যথাযথ প্রযুক্তি। ১৪৯৫ সালে একজন উপযুক্ত প্রযুক্তি ছাড়াই প্রথম রোবট বানানোর পরিকল্পনা করলেন। তিনি একজন মহা প্রতিভাধর মানুষ। তিনি পৃথিবীর একজন নামকরা চিত্রশিল্পী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ আরো কত কী! তিনি কিন্তু প্রথম একটা উড়োজাহাজেরও পরিকল্পনা করেছিলেন। তার নাম লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। এরপর তিনি রোবট তৈরির পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু প্রযুক্তির অভাবে তিনি আর রোবট বানাতে সফল হলেন না।

এরপর ১৭০০-১৯০০ সালের মধ্যে মানুষ অনেক ছোটোখাটো রোবট বানানোর চেষ্টা করে। আর অনেকে বানাতেও সমর্থ হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল একটা যান্ত্রিক হাঁস। হাঁসটা বানিয়েছিলেন জ্যাক দ্য ভকেনসন। এই হাঁসটা গলা বাড়াতে পারত, পাখা নাড়াতে পারত, এমনকি খাবার গিলতেও পারত! কেমন মজার ছিল না হাঁসটা! কিন্তু খাবার খাওয়ার পর খাবারের কি হতো? তা তো জানি না!

১৯১৩ সাল। পৃথিবীতে প্রথম কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে কাজে লাগানো হলো। কাজে লাগালেন হেনরি ফোর্ড, তার গাড়ির কারখানায়। কারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে যাওয়া একটা মোটা বেল্টের মতো চলমান,ওটাই হচ্ছে কনভেয়ার বেল্ট। তিনিই প্রথম এই স্বয়ংক্রিয় কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এটা আবার রোবট হয় কীভাবে? রোবটের হাত থাকতে হবে, পা থাকতে হবে, স্টিলের শরীর থাকতে হবে, তা নাহলে কিসের রোবট? আগেই বলা হয়েছে, যেই যন্ত্র নিজে নিজে কাজ করতে পারে, সেটাই রোবট। সেই হিসেবে কনভেয়ার বেল্টটাও একটা রোবট।

এই যন্ত্রগুলোকে মানুষ তখনো রোবট বলত না। ১৯২০ সাল থেকে বলা শুরু করল রোবট। আর নামটির প্রচলন করলেন ক্যারেল চ্যাপেক। তিনি একটি মঞ্চনাটক তৈরি করেন, নাম 'রসিউম'স ইউনিভার্সাল রোবটস'। সে এমন এক সমাজের গল্প, যেখানে মানুষ অনেক উন্নতমানের রোবট তৈরি করেছিল। পরে দেখা গেল ওই রোবটগুলোই তাদের কাল হয়ে দাঁড়াল। রোবটেরা সব ক্ষমতা দখল করে মানুষদেরই দাস বানালো!

এই গল্প নিয়ে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত বইও লেখা হয়েছে, বানানো হয়েছে অনেক ম্যুভি। যেমন: টার্মিনেটর, দ্য ম্যাট্রিক্স, কিংবা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। এমনি অনেক। এর ১২ বছর পর, ১৯৩২ সালে জাপান তৈরি করল এক সত্যিকারের রোবট। লিলিপুট নামে ১৫ সেমি. উচ্চতার একটি খেলনা রোবট বাজারে নিয়ে আসে। অবশ্য আকৃতিতে এতটাই ছোটো ছিল যে, একে খেলনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আর 'লিলিপুট' হু হু, করতে পারত আর বেশ জাঁক করে হাঁটতে পারত।

১৯৩৯ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ডস ফেয়ারে ৭ ফুট দীর্ঘ টিনের রোবটটি নিজের আগমন বার্তা জানান দেয় এই বলে যে, রোবটটি ৪৮টি ইলেকট্রিক্যাল রিলে দিয়ে তৈরি একটি বুদ্ধিমান সাহায্যকারী যন্ত্র।

ইলেক্ট্রো নামের এই রোবটটি মঞ্চে হেঁটে দেখায়, টেলিফোনের মাধ্যমে মানুষের কথা বুঝে কাজ করে এমনকি মঞ্চে একটি সিগারেটও খেয়ে দেখায়। অনেক অপূর্ণতা থাকলেও মানুষের বিকল্প হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে রোবট।

সে রোবটগুলোর মধ্য থেকে একটি এখনো মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানসফিল্ড মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে রয়েছে। বিশ্বের অন্যতম সেরা সায়েন্স ফিকশন লেখক রাশিয়ার আইজাক আসিমভ। ১৯৪১ সালে লিখলেন একটি গল্প, নাম 'লায়ার' মানে মিথ্যেবাদী। এটা রোবটদের নিয়ে লেখা বলেই বিখ্যাত নয়। এই গল্পে তিনি রোবটদের জন্য ৩টি মূলনীতিও দিয়েছিলেন। সেই মূলনীতিগুলোর জন্যই গল্পটা বিখ্যাত হয়েছিল। মূলনীতি ৩টি হলো–

১. একটি রোবট কখনোই কোনো মানুষকে আহত করবে না, এমনকি মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো কাজও করবে না।

২. একটি রোবট সবসময়ই মানুষের দেওয়া যে-কোনো আদেশ মানবে, শুধুমাত্র যদি সেটা প্রথম মূলনীতির সাথে সংঘাতপূর্ণ না হয়। মানে, যদি কোনো মানুষ এমন কোনো আদেশ দেয়, যেটা অন্য কোনো মানুষের জন্য বা সমগ্র মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর, তাহলে রোবট অবশ্যই সে আদেশ মানবে না।

৩. একটি রোবট অবশ্যই নিজেকে রক্ষা করবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা প্রথম দু'টা মূলনীতির সাথে সংঘাতপূর্ণ না হয়। মানে, মানুষের ক্ষতি না করে এবং মানুষের আদেশ অনুসরণ করে সে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলবে।

১৯৫০ সালে অ্যালান ট্যুরিং সে ব্যবস্থা করলেন, তিনি এমন এক পরীক্ষার প্রস্তাব করলেন, তুমি যার সঙ্গে কথা বলছ, সে রোবট না মানুষ। এর নাম দেওয়া হয় 'ট্যুরিং টেস্ট'।

এরপরে ১৯৫৪ সালে জর্জ ডেভল এবং জো ইংলেবারজার নামের দুজন বিজ্ঞানী প্রথমবারের মতো প্রোগ্রামযোগ্য রোবট বাহু ডিজাইন করেন। এর সাত বছর পর এটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল মটরস-এর প্ল্যান্টে এসেম্বলি লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে এই রোবটের কাজ ছিল গাড়ির যন্ত্রাংশ হিসেবে তৈরি স্টিলের গরম খণ্ডগুলোকে ঠান্ডা করার জন্য সারিবদ্ধভাবে স্থানান্তর করা।

এরপর রোবটের জগতে খুব দ্রুত কিছু বড়োসড়ো কাজ হয়ে গেল। ১৯৫৭ সালে রাশিয়া মহাকাশে পাঠাল প্রথম স্যাটেলাইট 'স্পুতনিক'।

১৯৬৪ সালে আইবিএম তৈরি করল প্রথম বলার মতো কম্পিউটার আইবিএম ৩৬০। ১৯৬৯ সালে রোবটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিনরা চাঁদ থেকেই ঘুরে এলেন।

যে একা একা কাজ করে সেটাই রোবট। স্যাটেলাইট একা একা কাজ করে। কম্পিউটারও তো তাই। আমরা বসে বসে কীবোর্ড টিপে টিপে আর মাউস চেপে চেপে নির্দেশ দেই, আর ও একা একাই গেমস রান করে, গান চালায়, ছবি দেখায়। তাহলে কম্পিউটারও এক প্রকার রোবট।

১৯৮৮ সালে তৈরি করা হলো মানুষ চালিত নয় বরং ভার বহনকারী বাহন রোবট। হাসপাতালের নার্সের কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায় রোগী বা মেডিকেল সম্পর্কিত জিনিসপত্র কোনোকিছুতে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া কোনো মানুষের কথা। আর এ কাজটি তার হাসপাতালের ব্যস্ত করিডর, মানুষ বা অন্য যে-কোনো বাধা পেরিয়ে তবেই শেষ করতে হয়। আর এই কাজটি কোনো মানুষ করছে না। করছে একটি যন্ত্র! এই যন্ত্রটি হলো 'হেল্পমেট'।

বর্তমান যুগে যখন ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চলে বা চালকবিহীন বিমান আকাশে ওড়ে তখন এই হেল্পমেট আশ্চর্যের কিছু না। কিন্তু ১৯৮৮ সালের সেই সময়ে এটিই ছিল অনেক কিছু। জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার এ কাজগুলো রোবটের হাতে দিয়ে মানুষ আরো গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে মন দিতে পারত।

স্বাস্থ্য সেবায় এ রোবট অনেকটা আশীর্বাদের মতো ছিল। খাবার বা ঔষধ থেকে শুরু করে এক্স-রে রিপোর্ট যাই হোক না কেন সঠিকভাবেই যথাস্থানে পৌঁছে দিত এ রোবট।

আগ্নেয়গিরি নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের বেশ ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হতো। অনেক ক্ষেত্রেই

দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকত এবং ঘটত। ১৯৯৪ সালে কার্নেগি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করল ৮ পায়ের এক রোবট। নাম দান্তে টু। শুধু তাই না, এই রোবট দিয়ে সংগ্রহ করা হলো আগ্নেয়গিরির ভেতরের গ্যাসের নমুনাও!

দান্তে ২ নামের একটি রোবট মানুষকে এই বিপজ্জনক কাজগুলো সরাসরি করা থেকে মুক্তি দেয়। মানুষের বদলে রোবটগুলোকে পাঠানো হতো গর্তের ভিতর। সেখান থেকে গর্তের গ্যাসগুলো পর্যবেক্ষণ করে তথ্য প্রদান করে। ১৯৯৩ সালে পৃথক দুটি প্রকল্পে কাজ করার সময় ৮ জন আগ্নেয়গিরি গবেষককে প্রাণ দিতে হয়। তবে দান্তে ২-এর মতো রোবট ব্যবহার শুরুর পর থেকে মাঠ পর্যায়ে এ ধরনের গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এতে করে গবেষকগণ আরো গভীরে গিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

১৯৯৭ সালে মে মাসের ১১ তারিখ রোবটের ইতিহাসে ঘটল এক বিরাট ঘটনা। এ দিন দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে ৬ রাউন্ডের খেলায় হারায় আইবিএম -এর তৈরি সুপার কম্পিউটার ডিপ ব্লু।

আইবিএম 'ডিপ ব্লু' নামে এক কম্পিউটারের মাথার ভেতর দাবা খেলার প্রোগ্রাম তৈরি করে ঢুকিয়ে দিল। আর তারপর সে খেলতে বসল তখনকার সেরা দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভের সঙ্গে। আর ঠিকই শেষ পর্যন্ত হারিয়ে দিল তখনকার সেরা এই দাবাড়ুকে।

কেমন লাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে যন্ত্রের কাছে হেরে যান? তবে হারবেন এমনটা ভাবতেই পারেননি দাবার এই গ্র্যান্ড মাস্টার।

একই বছর জাপানে শুরু হলো রোবোকাপ টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের লক্ষ্য ২০৫০ সালে রোবটদের এমন এক ফুটবল দল বানানো, যেটা পৃথিবীর সেরা ফুটবলারদের নিয়ে গড়া দলকেও হারিয়ে দেবে!

এদিকে বিখ্যাত ইলেক্ট্রনিক কোম্পানি সনি ১৯৯৯ সালে তৈরি করল 'আইবো' নামের এক কুকুর। এই রোবট কুকুর মালিকের সঙ্গে সাধারণ কুকুরের মতো আচরণ করতে পারে, শিখতে পারে, এমনকি মালিকের বিনোদনের দায়িত্বও এই কুকুরের! এরকম একটা কুকুর থাকলে বেশ মজাই হতো, তাই না? খাওয়ানোর কোনো বালাই নেই। কেবল আদর করা আর দুষ্টুমির সব মজার মজার খেলা করা যেত!

এরপর থেকে ছোটো ছোটো রোবট তৈরি হতে লাগল। একেকটা একেক কাজে ব্যবহার হয়। ২০০৪ সালে এপসন তৈরি করল পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট রোবট। লম্বায় মাত্র ৭ সে.মি.। আর ওজনও মাত্র ১০ গ্রাম। হেলিকপ্টারের আকৃতির উড়ুক্কু এই রোবটটি আসলে উড়ুক্কু ক্যামেরা! প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এটা কাজে লাগানো হয়।

এছাড়াও রোবোনাট ২ নামের একটি রোবটকে মহাকাশে অভিযাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এটিকে মহাকাশে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল মূলত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো করানো, যাতে করে বিজ্ঞানীরা অন্যান্য কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন।

আবার ২০০৫ সালে কর্নেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা তৈরি করেন আরেক আশ্চর্য রোবট। রোবটটি অনেকগুলো ছোটো ছোটো কিউব দিয়ে তৈরি। চুম্বকের মাধ্যমে এগুলো একসঙ্গে মিলে থাকে। এই রোবটটি এটা নানা আকৃতি নিতে পারে।

মানুষ যে রোবট চায়, রোবটকে দিয়ে কাজ করাতে চায়, সেটারও প্রমাণ পাওয়া গেল ২০০৮ সালে। ২০০২ সালে বাজারে ছাড়া হয়েছিল রুম্বা নামের এক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রোবট। মাত্র ৬ বছরেই এই ক্লিনার রোবট বিক্রি হয়েছে আড়াই মিলিয়নেরও বেশি।

২০১৪ সালে এল বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রোবট। ইউগ্যান গোস্টম্যান, দেখতে ইউক্রেনের দশ বছর বয়সি এক বালকের মতো। এটি মূলত একটি রোবট হলেও, দুর্বল ইংরেজি জ্ঞানে এটি ৩৩% বিচারককে নিজেকে মানুষ হিসেবে বোঝাতে সক্ষম হয়। এটি ছিল রাশিয়ান একটি রোবট।

শতকরা ৩৩ ভাগ লোক এটিকে মানুষ ভাবলেও, নিন্দুকেরা বাকি ৬৭ ভাগ লোকের মতামত নিয়েই মেতে আছে। তবে এর

নির্মাতারা এর ভাষাগত বিষয়টিতে আরেকটু নজর দিলে এ নিয়ে আর কোনো সমালোচনার সুযোগ থাকত না।

তবে বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রোবটটি প্রথম 'বুদ্ধিমান' রোবট হিসেবে যথেষ্ট সফল ছিল।

২০১৫ সালের জুন মাসে রোবটের কী মন আছে? সেটা নিয়ে ভাবনা শুরু হলো। এতক্ষণ আমরা রোবটের কাজের কথা শুনলাম। রোবট মানুষের অনেক কাজ করে দিতে পারে। যা আগে মানুষের নিজে করতে হতো। মানুষের ভাবনা ছিল রোবটের কাজ শুধুই কাজ করা, এদের কোনো আবেগ-অনুভূতি নেই। কিন্তু সে ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছে রোবট।

পিপার নামের রোবটটি এরকম কোনো কাজের যন্ত্র শুধু না। পিপার এমন এক যান্ত্রিক রোবট যার মাঝে আবেগ অনুভূতি খুঁজে পাওয়া যায়।

এর ভিতরে থাকা সেন্সরগুলো ব্যবহার করে এটি মানুষের অনুভূতি বুঝতে পারবে, এমনকি নিজের অনুভূতিও প্রকাশ করে।

এ রোবটটি এখন ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জাপানিজ আর স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে পারে।

২০১৫ সালের জুলাই মাসে রোবট জগতে পা রাখল মানুষের অবস্থা শনাক্তকারী রোবট। টিউরিং টেস্ট সঠিক বা ভুল যে-কোনো কিছুই হতে পারে। এর ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করে বিচারকের উপর। ৫৮ সে.মি. লম্বা এ রোবটটি মানুষের অবস্থান বুঝতে পারে। এমনকি মানুষের সাথে কথাও বলে।

এটি ২০০৬ সালে তৈরি করা হলেও এবারই বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এটিকে উপযুক্ত করা হয়। এটি প্রয়োজন মতো কথা বলতে পারে আর অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। এরকম রোবট এর আগে দেখা যায়নি।

রোবোটিক নিবন্ধ

ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন, রোবট ও একজন আইজ্যাক আসিমভ

আবুল বাসার

প্রায় ২৫০ বছর আগের ঘটনা। ইতালির বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভানি হঠাৎ চমক জাগানো এক আবিষ্কার করে বসেন। মৃত ব্যাঙের পা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একদিন ঘটল আজব এক ঘটনা। লোহা ও তামার তার দিয়ে ব্যাঙকে স্পর্শ করতেই সেটি আচমকা নড়ে উঠল। একে প্রথমে ভুতুড়ে কাণ্ড ভেবে ভয় পেলেন গ্যালভানি। পরে তার ধারণা হলো, মৃত ব্যাঙে হয়ত প্রাণ ফিরে এসেছে। এ বিষয়ে তার লেখা প্রতিবেদন সেকালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। হইচই পড়ে যায় ইউরোপে। তবে শিগগিরই ভুল ভাঙে গ্যালভানির। কয়েক বছর গবেষণায় তিনি বুঝতে পারেন, বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে এমনটি ঘটছে। আসলে তার গবেষণাগারে এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছিল, যা সেসময় গবেষণার কাজে লাগত বিজ্ঞানীদের। যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ তৈরি করত। এ স্ফুলিঙ্গ মৃত ব্যাঙে স্পর্শ করায় সেটি নড়ে উঠেছিল। অনেক খেটেখুটে আসল ব্যাপার তো বোঝা গেল। কিন্তু মরা ব্যাঙ নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকায় ততদিনে তার কপালে জুটল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। নিন্দুকেরা তার নাম দিল 'ব্যাঙ নাচানো অধ্যাপক'। মজার ব্যাপার, আজ সেই নিন্দুকেরা টিকে নেই, আছেন গ্যালভানি। কারণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে, বিদ্যুৎ সম্পর্কিত দুটি বিষয় গ্যালভানিজম, গ্যালভানিজেশনে জড়িয়ে আছে তার নাম। আবার তার সম্মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছে গ্যালভানোমিটার।

যাই হোক, গ্যালভানির মরা ব্যাঙ নাচানো দেখে সেকালে অনেকে ভেবেছিলেন জীবনের গুপ্ত রহস্য বোধ হয় এবার উদ্‌ঘাটিত হয়েই গেল। সে সময়ের বিখ্যাত দুজন ইংরেজ কবি জর্জ গর্ডন বায়রন আর পার্সি বিশি শেলিও তেমনটিই ভেবেছিলেন। ১৮১৬ সালে সুইজারল্যান্ডে ছিলেন তারা। এক সন্ধ্যায় তাদের সাথে ছিলেন বায়রনের চিকিৎসক আর শেলির বান্ধবী মেরি উলস্টোনক্র্যাফট। মেরিকে সে বছরই বিয়ে করেন শেলি। সেদিন তারা গ্যালভানির চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, চারজন অদ্ভুতুড়ে ও অস্বাভাবিক ঘটনা নিয়ে গল্প লিখবেন। তবে বায়রন ও শেলি কথা রাখতে পারলেন না। অবশ্য বায়রনের চিকিৎসক একটি গল্প লিখলেও সেটি তেমন সাড়া জাগায়নি। অন্যদিকে একুশ বছর বয়সি মেরি ১৮১৮ সালে এক বই প্রকাশ করেন। মেরি শেলির সেই বিখ্যাত বইটির নাম ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন। বইটিতে বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। মৃতদেহ থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠা মানুষটির দেহ ছিল বিশালাকৃতির। আর চেহারা কদাকার ও বেঢপ, যাকে কিম্ভূতকিমাকার দানবের সাথেই তুলনা করা চলে। ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন ওই দানবকে ভীষণ ভয় পেয়ে এক পর্যায়ে তাকে তাড়িয়েও দেন। শেষমেষ হতাশ হয়ে ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন ও তার পরিবারের ওপর রক্তাক্ত প্রতিশোধ নিয়েছিল দানবটি। ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন পাঠকদের বলেছিল, কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি করা ভয়ংকর।

এ বইটিই প্রথম সার্থক বিজ্ঞান কল্পকাহিনি হিসেবে ধরা হয়। সেকালের নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে লেখা হলেও গল্পটির কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। পরের একশ বছরে বিজ্ঞান কল্পগল্প লেখা হলেও

সেগুলোর কোনোটাই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো নাম কুড়াতে পারেনি। দীর্ঘ বিরতির পর, ১৯২০ সালে চেকোস্লোভিয়ান লেখক কারেল চাপেক আর.ইউ.আর. নামে একটি নাটক লেখেন। পরের বছর নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকে রোসাম নামের এক লোক চাবি দেওয়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বানাতেন, যেগুলো দেখতে মানুষের মতোই। মানবজাতিকে শ্রমের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতেই এদের বানানো হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। শিগগিরই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মতো এ যন্ত্র মানবরা ভয়ংকর হয়ে পৃথিবী থেকে মানবজাতিকে চিরতরে মুছে ফেলে। তবে বেঁচে যান রোসাম। আর.ইউ.আর. (R.U.R.) অদ্যাক্ষর দিয়ে রোসামের কারখানার নাম বোঝানো হয়েছিল, যার পূর্ণ অর্থ রোসাম'স ইউনিভার্সাল রোবটস *(Rossum's Universal Robots)*। চেক ভাষায় রোবট *(robot)* অর্থ 'অনৈচ্ছিক কর্মী' বা 'ক্রীতদাস'। তাই এ নাটকের কল্যাণে কালক্রমে রোবট শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'কৃত্রিম মানুষ'। এখন স্বচালিত যন্ত্র বোঝাতে প্রায় সব ভাষাতেই 'রোবট' শব্দটি ব্যবহার হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পাল্লা দিয়ে এরপর বিজ্ঞান কল্পগল্পের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ১৯২৬ সালে পুরোপুরি বিজ্ঞান কল্পগল্প নির্ভর প্রথম ম্যাগাজিন 'অ্যামেজিং স্টোরিজ' প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে একই ধরনের আরো কটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। এতে বছরে কয়েক শত বিজ্ঞান কল্পকাহিনি প্রকাশিত হতো, যার অনেকগুলোর বিষয়বস্তু রোবট। মেরি শেলি আর চাপেকের প্রভাবে প্রায় সব বিজ্ঞান কল্পগল্পেই রোবটকে ভয়ংকর চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হতো।

ঠিক এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আইজ্যাক আসিমভ নামের এক তরুণ লেখক পুরনো এই ছকের বাইরে অন্য ধরনের রোবটের গল্প লেখার সিদ্ধান্ত নেন। ছোটোবেলা থেকেই লেখালেখির আগ্রহ দেখে তাকে টাইপরাইটার কিনে দিয়েছিলেন বাবা। ১৯৩৭ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্রথম বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লিখতে শুরু করেন আসিমভ। গল্পটির নাম কসমিক কর্কস্ক্রু। ১৯৩৮ সালে গল্পটি লেখা শেষ করেন আসিমভ। প্রথম গল্প লেখার তীব্র উত্তেজনায় যা হয় আর কি! সাতপাঁচ না ভেবেই গল্পটি সেকালের বিখ্যাত বিজ্ঞান কল্পকাহিনির পত্রিকা অ্যাসটাউন্ডিং-এর সম্পাদক ডবিউ ক্যাম্পবেলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। গল্পটি স্রেফ বাতিল করে আসিমভকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন ক্যাম্পবেল। শুধু প্রথমটিই নয়, পর পর ১২টি গল্প বাতিল করেন ক্যাম্পবেল। তবে হতাশ না হয়ে লেখা চালিয়ে যান আসিমভ। তার পরের বছর অন্যান্য পত্রিকায় গল্প বিক্রি করতে শুরু করেন তিনি। অবশেষে আসিমভের লেখা ৩২তম গল্পটি ছেপে ছিল অ্যাসটাউন্ডিং। গল্পটির নাম নাইটফল, যা সর্বকালের সেরা বিজ্ঞান কল্পকাহিনি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এরপর অ্যাসটাউন্ডিং পত্রিকায় নিয়মিত লেখক আর ক্যাম্পবেলের বিশ্বস্ত বন্ধু বনে যান আসিমভ। ১৯৩৯ সালে নতুন ধরনের রোবটের গল্প লেখেন আসিমভ। সেই গল্পে রোবট এক সাধারণ যন্ত্র, যাকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বানানো হয়েছিল। এছাড়া রোবটটি আগে থেকেই

রক্ষাকবচসহ তৈরি করায় সে কারো ক্ষতি করতে পারত না। রোবটের এই নতুন ধাঁচের কাহিনি দ্রুতই জনপ্রিয়তা পায়। এরপর রোবট নিয়ে একের পর এক গল্প লিখে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন আসিমভ।

আসিমভের গল্পের রোবটে আগে থেকেই ঢুকিয়ে দেওয়া সেই রক্ষাকবচকে ডাকা হতে লাগল 'রোবোটিক্সের তিনটি সূত্র' হিসেবে। এখন রোবট সংক্রান্ত প্রায় গল্পেই এ তিনটি সূত্র থাকে। সূত্রগুলো হচ্ছে: ১. রোবট কখনো মানুষের ক্ষতি করবে না বা কোনো মানুষের কোনো ক্ষতি হতে দেবে না। ২. রোবট অবশ্যই মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে, যদি না সেই নির্দেশ প্রথম সূত্রকে লঙ্ঘন করে। ৩. রোবট সবসময় নিজেকে রক্ষা করবে, যদি না তা প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রকে লঙ্ঘন করে।

আসিমভ রোবোটিক্সের তিনটি সূত্র প্রথম উল্লেখ করেছিলেন ১৯৪২ সালে প্রকাশিত রানঅ্যারাউন্ড *(Runaround)* গল্পে। এ গল্পের মাধ্যমে রোবোটিক্স *(robotics)* শব্দটিও প্রথমবার ছাপার অক্ষরে দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে রোবট নিয়ে পড়ালেখা, নকশা, রোবট বানানো, রক্ষণাবেক্ষণ ও রোবট মেরামত বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার হয়।

এই তিনটি সূত্রই ছিল রোবট নিয়ে মানুষের আতঙ্কের অবসানে প্রথমবার কোনো সত্যিকারের প্রচেষ্টা। আসিমভের ভাষায় রোবট নিয়ে মানুষের এ আতঙ্কের নাম 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কমপ্লেক্স'। তার প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। আসিমভের রোবটের গল্পের কারণে পুরনো ধাঁচের রোবটের গল্প একসময় অচল হয়ে পড়ে। এতে অনেকেই সেকেলে ধাঁচের রোবটের গল্প লেখা বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি রোবটকে তারা নিরীহ ও উপকারি, এমনকি ভালোবাসার যোগ্য চরিত্র হিসেবে গল্পে তুলে ধরতে শুরু করেন। এর ধারাবাহিকতায় 'স্টার ওয়ার্স' চলচ্চিত্রে C3PO আর R2D2 নামের দুটি রোবট দেখা গিয়েছিল, যারা দর্শকদের সব মনোযোগ কেড়েছিল।

অবশ্য একটা কথা অনস্বীকার্য, বিজ্ঞান কল্পকাহিনি নিজে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। রোবট নিয়ে সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত লেখা সব গল্প একটি রোবটও বাস্তবে হাজির করতে পারবে না। আসলে বিজ্ঞান কল্পকাহিনিকে একেবারে আনকোরা এক ধরনের রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনি হিসেবেও দেখা যেতে পারে। নতুন এই রূপকথা লেখা হয় জাদুমন্ত্র আর অলৌকিক ঘটনার বদলে প্রকৃতি আর বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, জাদু আর অলৌকিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনি সম্ভবত কখনোই সত্যি হয় না। কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনা আর বিজ্ঞানকে পুঁজি করে লেখা রূপকথা অনেক সময় সত্যিও হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিজ্ঞান কল্পকাহিনি নামের এই রূপকথা বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের উৎসাহ যোগায়। গল্পে বর্ণিত কোনো উন্নত কিছু নিয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হন তারা। উদাহরণ হিসেবে ১৯৫০ সালের এক ঘটনার কথা বলা যায়। সে বছর রোবট নিয়ে আসিমভের লেখা নয়টি গল্প একত্রিত করে 'আই, রোবট' *(I, Robot)* নামে বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সাথে বইটি প্রভাবশালী বলেও প্রমাণিত হয়েছিল।

বইটির প্রথম দিকের পাঠক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জোসেফ এফ. এঙ্গেলবার্গার। এটি পড়ে তিনি ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বাকি জীবন রোবটের পিছনে উৎসর্গ করতে মনস্থির করেন। পরে প্রকৌশলী জর্জ ডেভোলের সাথে যৌথভাবে বিশ্বের প্রথম রোবট কারখানা খোলেন তিনি; নাম ইউনিমেশন ইনকর্পোরেট। তাকে বলা হয় রোবোটিক্সের জনক। এ প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্বের প্রথম রোবট তৈরি হয়েছিল, যা শিল্পকারখানায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। সেই ছিল শুরু, এখন তো সারা বিশ্বে ঘর ঝাড়ু দেওয়া থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণায় রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে যারা রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করেন, তাদের অধিকাংশই 'আই, রোবট' পড়েছেন এবং বইটি দিয়ে প্রভাবিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আইজ্যাক আসিমভ রোবট নিয়ে কোনো কাজ বা গবেষণা করেননি, শুধু তাদের নিয়ে গল্প লিখতেই পছন্দ করতেন। তবুও রোবটের ইতিহাসে তার নাম স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

[আইজ্যাক আসিমভের 'হাউ ডু উই নো অ্যাবাউট রোবট' অবলম্বনে]

একদিন এক রোবট কারখানায়

মঈনুল আহসান সাবের

ভাগ্যি বাবু ছিল। বাবু আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। কাজটা শেষ পর্যন্ত ও'ই করে আমাকে ভীষণ ঘোরাঘুরি আর ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। বাবু যেদিন অনুমতিপত্রটা হাতে এনে দিল, মিথ্যে বলব না, খুব ভালো লাগছিল।

সত্যি কথা বলতে কী, কোনো এক রোবট কারখানায় ঘুরে আসার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। রোবট কীভাবে তৈরি হচ্ছে, তাদের চালচলন কেমন, দেখতে সেসব মজার বৈ কি! শুনেছিলাম, 'আধুনিক রোবট কারখানা' অন্যান্য সব কারখানার চেয়ে অনেক ভালো। সেই শোনার পর থেকে কেমন একটা রোখ চেপে গেল, একদিন ঘুরে আসবই। কিন্তু বললেই কী হয়? কারখানাগুলো আবার প্রহিবিটেড এরিয়া, অর্থাৎ সংরক্ষিত এরিয়া। তাই যাব বললেই যাওয়া হয় না। যেমন তেমন কাউকে ওরা কখনো ঢুকতে দেবে না। ঢোকার পারমিশনের জন্যে এটা কর, ওটা কর, সে এক ঝুড়ি কাজ। এদিক ওদিক ঘুরে লেখলাম, উঁহু, সে মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। অনুমতিপত্র জোটানো শক্ত।

বাবুর সাথে দেখা হচ্ছিল না অনেকদিন। ও আবার একটু ভবঘুরে ধরনের। এই আছে তো এই নেই। এক দুপুরে গাছপালা, আকাশ দেখা বাদ দিয়ে রোবট আর তাদের কারখানার কথাই ভাবছিলাম, হঠাৎ বাবু এসে হাজির। হিজিবিজি কথার পর রোবট কারখানার কথা বলে ফেললাম। শুনে তো হাঁ হাঁ করে হেসে উঠল- 'আরে, তুই আগে বলবি তো, আমার মামা, আধুনিক রোবট কারখানার পরিচালক, দাঁড়া কালকেই তোকে অনুমতিপত্র এনে দিচ্ছি।

এ দেখি মেঘ না চাইতেই জল। আমি তো তখন কোনো ছোটোখাটো এক কারখানা ঘুরে আসতে পারলেই বর্তে যাই। বাবু দু-দিন পর অনুমতিপত্র এনে দিল। সাদা কাগজে লেখা ছিল-অমুককে অমুক দিনে অমুক সময় হতে অমুক সময় পর্যন্ত আধুনিক রোবট কারখানা পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হলো।' নিচে বাবুর মামার নাম। নামটা পড়তে পারলাম না। যা বিদঘুটে হাতের লেখা। যাক্‌গে, তাতে কী, অনুমতিপত্র পেয়েছি, এই ঢের।

সেদিন সকালে উঠেই গোসল সারলাম। চুল আঁচড়িয়ে নিলাম ভালোভাবে। ইস্ত্রি করা সবচেয়ে ভালো জামাকাপড়গুলো পরলাম। বাবু বলেছিল, ওর মামা খুব টিপ-টপ। কোথাও অগোছালো এলোমেলো কিছু দেখলেই রেগে ফায়ার হয়ে যান। সেজেগুজে ঘর থেকে বেরিয়ে জুতো জোড়াকে ঝকঝকে তকতকে করিয়ে নিলাম। কারখানাটা শহরের একেবারে এক কোণে। সেখানে পৌঁছানোও কম ঝামেলার কাজ নয়।

একবার বিদেশি সার্কাস দেখেছিলাম। সেখানে অনেক ঝোলাঝুলি ব্যাপার ছিল। তাদের অনুকরণে কোনোমতে বাসের দরজার হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে এমন কসরতে পৌঁছে গেলাম যে, সেই বিদেশি সার্কাস পার্টি যদি সে দৃশ্য দেখত, তবে আমাকে তাদের দলের সদস্য করে নেওয়ার জন্যে নির্ঘাত ঝুঁকে পড়ত।

বিরাট দুর্গের মতো সাদা বাড়ি। প্রাচীর, নেট দিয়ে ঘেরা। অনুমতি ছাড়া কোনো ছারপোকা, মশামাছিও ঢুকতে পারবে না। গেটে বুকটান করে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক, আমার কী! একটু আগেই পৌঁছে গেছি। চারদিক ঘুরে ফিরে যখন সময় হলো তখন গেটে গিয়ে অনুমতিপত্রটা দেখালাম। তীক্ষ্ণ চোখে সেটা দেখল একজন। তারপরেই দু'পা পিছিয়ে খটাশ করে স্যালুট দিল। থতোমতো খেয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই, না অফিসার ধরনের কেউ আসেনি। একটু সময় লাগলেও ব্যাপারটা ধরতে পেরে হাসি পেল। আমাকেই কোনো অফিসার ভেবে-টেবে ব্যাটারা স্যালুট ঠুকে বসেছে। যাকগে।

ভেতরে ঢুকতেই লন। তারপর বিল্ডিং-এ পা দিতেই বিরাট এক হলঘর, অথচ ফাঁকা। সামনে শুধু ঢাউস ডেস্ক পাতা 'রিসিপশন' আর দু'সেট সোফা। সেদিকে এগোতেই ছোকরা মতো একজন উঠে দাঁড়িয়ে শুধালো- 'ইয়েস?'

অনুমতিপত্রটা দেখাতেই সে আমাকে এক নাম্বার ঘরের কথা বলল। একটানা অনেকগুলো ঘর বাঁ পাশে। এক নাম্বারে ঢুকতেই প্রথমে নজরে পড়ল টাক মাথা, তারপর আস্তে আস্তে পুরো শরীরটা। দেখেই চিনলাম বাবুর মামা, বাবুর বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আমি পরিচয় দিতেই বসতে বললেন। বসতেই ফোঁস করে বিরাট নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন— 'তা তুমি নীল কালি না হলুদ কালি দিলে লেখ?'

এ আবার কী ধরনের প্রশ্ন বাপু! বলেছিল ওর মামা সাফসুতরা থাকতে ভালোবাসেন কিন্তু রং-বেরঙের কালিও যে পছন্দ করেন তা তো বাবু বলেনি। আমিও না ভেবে-চিন্তে বলে দিলাম-'নীল কালি।' শুনে খুব খুশি হলেন মনে হলো, বললেন-ঠিক, কখনো হলুদ কালি দিয়ে লিখবেন না, হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাবে।' আরো কী সব বলতে যাচ্ছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম— 'আচ্ছা, আমি তবে এবার ঘুরে ফিরে দেখতে আরম্ভ করি।' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই'-বলে মামা একটা বেল টিপলেন।

গম্ভীর মুখ সুন্দর চেহারার বছর বাইশের এক ছেলে এল। মামা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'আমিন, একে একটু কারখানাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাও। আমিন গম্ভীর মুখেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল-আসুন।'

দেখতে আরম্ভ করলাম ঘুরে ফিরে। আমিন প্রথমেই কারখানার ইতিহাস জানিয়ে দিল। আজকাল লোকজন নাকি ঘরদোরের কাজের জন্য রোবট কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আমিন আরেকটা মজার কথা বলল, গেটের পাহারাদার দু'জন আর রিসিপশনের লোকটা তিনজনই নাকি রোবট। শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। আমি আমিনকে খুব তারিফ করলাম। কিন্তু ও বিন্দুমাত্র খুশি না হয়েই বলল—তবে মানুষের মতো সবকিছু করলেও ঠিক মানুষের বুদ্ধিটা ওদের দিচ্ছি না, বুঝতেই পারছেন'—বলেই চোখ টিপল। আর আমিও কিছু না বুঝেই হ্যাঁ হ্যাঁ করে সায় জানালাম। আমিন এবার বিচ্ছিন্ন রোবটের ঘর দেখাতে আরম্ভ করল।

একেক ঘরে একেক ধরনের রোবট। এদের ওপর বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল, কিন্তু একটাও সাকসেসফুল নয়, কিছু খুঁত রয়েই গেছে। প্রথমে যে ঘরে গেলাম তার দরজায় লেখা ছিল 'লাজুক রোবট'। ভেতরে ঢুকে দেখলাম ১৬/১৭ জন হুবহু মানুষের মতো রোবট বসে গল্প করছে। আমাদের দেখে সাথে সাথে তারা লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখল। যেন গল্প করে ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছে।

আমিন গম্ভীর হয়ে বলল-'শোনো, এই লোকটা তোমাদের দেখতে এসেছে।' লজ্জা কাটিয়ে কোনোমতে দু'একজন উঠল। কাছে এসে মিনমিনে গলায় বলল- 'সুপ্রভাত, কী করব আপনার জন্যে বলুন, চা এনে দেবো কি?'

দেখলাম বেচারা লজ্জায় প্রায় মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। বললাম-'না, না, কোনো কিছু দরকার নেই,

আপনারা বসুন। লজ্জায় অধোবদন একজন কোনোমতে মুখ তুলল- 'আচ্ছা, কিন্তু কিছু দরকার হলে অবশ্যই চাইবেন।' আর লজ্জা না দিয়ে আমরা দ্বিতীয় ঘরে গেলাম। ঘরটা অসুস্থ রোবটদের। হাসপাতালের মতো অনেকগুলো বিছানা পাতা। অনেক রোগী ঘুমুচ্ছে। একজন হাতের ইশারায় আমিনকে কাছে ডাকল। আমিও গেলাম সাথে। রোবটটা বলল- 'ডাক্তার সাহেব, আজ একটু তেল খাওয়া চলবে? 'মাথা নাড়ল আমিন- 'খবরদার, ও কাজটা করবে না, তোমার শরীর এখনো পারফেকট হয়নি, ক্যাপসুলগুলো খেয়েছ?' রোবট মাথা নাড়ে, খেয়েছে।

আমরা একটু ঘুরে ফিরে রোগীদের চার্ট দেখে তৃতীয় ঘরে গেলাম। তৃতীয় ঘরটা অপূর্ণাঙ্গ রোবটদের। ভাঙাচোরা অবস্থায় সব পড়ে আছে। কারো হাত নেই, কারো পা, কারো চোখ। আমিনকে দেখে সবাই ম্লান চোখে তাকালো। একজন প্রায় কেঁদে ফেলল-'এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ, তার চেয়ে আমাদের গলিয়ে ফেলে নতুন করে বানাও'।

আমিন বলল- 'তাই কী হয়, এখনো এক্সপেরিমেন্ট বাকি তোমাদের উপর, তারপর দেখা যাবে।' আমি একটু সান্ত্বনা দিলাম ওদের। তাই কী শোনে? চোখের পানি ফেলছে, আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে।

পাশের ঘরটা অলস রোবটদের আস্তানা। ঘরে ঢুকে দেখি প্রায় সবাই শুয়ে, আর দু'তিনজন বসে। কিন্তু যারা বসে ছিল আমাদের দেখেই তারা শুয়ে পড়ল। একজন মুখ তিরিক্ষি করে বলল-'কী, আবার এসেছ? শুধু কাজ, যাও যাও, এখন কোনো কাজ-টাজ নয়, এখন একটু বিশ্রাম নেব, সারাদিন যে খাটুনি গেল। বলে সত্যি সত্যিই সে পাশ ফিরে চোখ বুঁজল।

একজনকে দেখলাম হাসির বই পড়তে পড়তে খুব হাসছে। তাই দেখে অন্য জন রোবট পাশের জনকে বলছে- 'দেখ ব্যাটার কাণ্ড, একসাথে দু'দুটো কাজ করছে, পড়ছে আবার হাসছেও। দু'জনে মিলে দেখলাম হাসির বই পড়ুয়াকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার প্ল্যান করছে। একজন দেখলাম, চোখ বন্ধ করে খুব আস্তে আস্তে বলছে-'মরে গেলেই ভালো হত, এত পরিশ্রম আর সহ্য হয় না। এই যে আমি বেঁচে আছি, আমাকে ভাবতে হচ্ছে, আমি বেঁচে আছি–এটাই কি কম পরিশ্রমের কাজ?' বলেই সে পাশ ফিরে চেঁচালো-'আরে বাপু, এক কথা কতবার বলব, লাইট নিভিয়ে বেরিয়ে যাও তোমরা, এখন আমরা বিশ্রাম নেব।'

হাসতে হাসতে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমিন বলল-আসলে এই একটা কাজই ওরা পারে।

পাশের ঘরে ঢোকার আগে আমিন আমাকে সাবধান করে দিল। এটা দু'মুখো রোবটদের ঘর। ঘরে ঢুকতেই কোত্থেকে সব এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল যেন ওরা আমাদের প্রতিক্ষায়ই ছিল। একজন তখুনি বাতাস করতে লেগে গেল। একজন একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজের জামা দিয়েই সেটার ধুলো সাফ করে দিল। নীল জামা পড়া রোবটটা বিনয়ে গলে গিয়ে বলল-'হে মহান অতিথি। কি সৌভাগ্য আমাদের, আপনি আমাদের দেখতে এসেছেন, আমরা আজ গর্বিত, আমরা আজ ধন্য। মহামূল্যবান সময় নষ্ট করে আপনি এসেছেন, আমরা কৃতার্থ। বলে সে একগাল হাসল। আমি এরপর লালজামা পড়া রোবটটার সাথে কথা বলছিলাম।

হঠাৎ দেখি, সে মুচকি মুচকি হাসছে। কেন হাসছে দেখার জন্যে পেছনে তাকাতেই দেখি, নীল জামা পড়া রোবটটা যে এতক্ষণ বলছিল আমি যাওয়ার জন্যে তারা ধন্য এইসব, জিভ বের করে আমাকে ভেংচি কাটছে। দেখে ফেলেছি দেখেই সে তাড়াতাড়ি পাশের জনের কাছ থেকে হাতপাখা কেড়ে নিয়ে আমাকে বাতাস করতে লাগল।

এ সময় একজন এসে হঠাৎ অটোগ্রাফ চাইল। আমি তো অবাক। খুব জোরাজুরি করলে শেষে অবশ্য খুশি মনেই তার অটোগ্রাফ খাতায় নাম লিখে দিলাম। একটু পরেই শুনি সে পাশের জনকে বলছে-'ব্যাটা অটোগ্রাফ দিয়ে ভাবল আমাকে ধন্য করে দিয়েছে, হু, এখান থেকে গেলেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব, একটু তেল দিয়ে রাখলাম শুধু, যে দিনকাল পড়ছে।'

আমি ভেতরে ভেতরে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে উঠব ভাবছি, দেখি একজন শরবত নিয়ে এসেছে। ভীষণ খুশি হলাম, এত ঘোরাঘুরির পর এক গ্লাস শরবত সত্যি দরকার ছিল। এক চুমুকে সবটা শেষ করে দিলাম। গ্লাসটা ফেরত দিতে যাব, দেখি, সে মিটিমিটি হাসছে আর পাশের জনকে বলছে- 'আহা, কী আরাম করেই না শরবত খেলো, বুঝবে বুঝবে একটু পর, জোলাপ মিলিয়ে দিয়েছি।

আমার আর সহ্য হচ্ছিল না, আমি কটমট করে তাকাতেই সে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল-'শরবত পছন্দ হয়েছে?' কিছু না বলে গ্লাসটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠতে যাব, এমন সময় একজন, যে এতক্ষণ ঘরের এক কোণে খাতা-কলম নিয়ে কী যেন করছিল, সে এগিয়ে এসে আমার পা ছুঁয়ে বলল-'সামনেই আমার পরীক্ষা। আশীর্বাদ করবেন পরীক্ষা যেন ভালো হয়। আমি অপ্রস্তুত হয়ে পা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলাম।

পাশের ঘরটা বিদ্রোহী রোবটদের, সেদিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে আমিন বলল-'আপনার সার্টের পিছন দিকে কালি লাগল কীভাবে? কোনোমতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি আমার সাদা সার্টের পেছন দিক কলমের কালো কালিতে একাকার। আর কে? একটু আগে দু মুখো রোবটদের যে ছোকরা পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিচ্ছিল সে ছাড়া এমন কাজ আর কে করবে?

মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদ্রোহী রোবটদের ঘরে ঢুকতেই চমকে গেলাম। সব ফিসফিসিয়ে নিজেদের মধ্যে কী সব আলাপ করছিল। আমাদের ঢুকতে দেখেই একজন চেঁচিয়ে উঠল,-'হুঁশিয়ার, গুপ্তচর।' সঙ্গে সঙ্গেই সবাই উঠে দাঁড়ালো। নেতা গোছের একজন লাফিয়ে উঠল এক নড়বড়ে টেবিলের ওপর। দু'জন টেবিলটা ধরে রাখল যেন ভেঙে না পড়ে।

নেতা বক্তৃতা দিতে লাগল-'কমরেডস, সাম্রাজ্যবাদীরা আবার এসেছে, কিন্তু আমরা তাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, আমরা কোনোক্রমেই তাদের বশ্যতা স্বীকার করব না। আমাদের দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিয়ে নেবে, এ আমরা মেনে নিতে পারি না। আমাদের দেহের একটি মাত্র কলকব্জা ঠিক থাকা পর্যন্ত আমরা তাদের বাধা দেবো।'

বক্তৃতা থামতেই তারা সবাই মিলে শ্লোগান দিল 'আপোস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম; মানুষে রোবটে পার্থক্য করা চলবে না।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি, হঠাৎ দেখি বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল লেগে গেছে। নেতা গোছের দু'তিনজন আলাদা হয়ে গেছে। একজন বলছে-'আমাদের বিপ্লব এ পথে হবে'; অন্যজন বলছে– 'না কক্ষনো নয়, আমাদের বিপ্লব হবে এ পথে।' নেতারা সব নিজেদের কথা বলছে।

শেষে বিদ্রোহীরা বিপ্লবের উদ্দেশ্যে আমাদের ওপরেই না ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। আমিন নির্বিকারভাবে বলল–'এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে এদের প্রায় মানুষ বানিয়েই ফেলেছিলাম, দেখলেন তো, ঠিক মানুষের মতোই বুদ্ধি।'

এরপর আমরা গেলাম সুস্থ রোবটদের আস্তানায়। বেশ কয়েকজন ভদ্রলোককে দেখলাম পারমিট হাতে রোবট কিনতে এসেছেন। দিন দিন বাড়িঘরের নানা কাজে রোবটদের ডিমান্ড খুব বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, অফিসের সব কাজ তো রোবটরাই করছে, মানুষজন বসে বসে শুধু হাই তোলে আর রোবটদের বোতাম টেপে।

এরপর আমিন আমাকে নিয়ে গেল যেখানে রোবট তৈরি হচ্ছে সেখানে, বিরাট ঘর। চারদিকে কলকব্জা। প্রথমে রোবটের শরীর বানানো হয়। তারপর দেওয়া হবে সাধারণ বুদ্ধি, এরপর কথা বলা শেখানো হবে-এভাবে আরো তিন-চার রকম প্রক্রিয়ার পর পুরো সুস্থ রোবট তৈরি হচ্ছে। শুধু প্রাণ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না, বুকের মাঝখানে লোহার যে মেশিনটা রাখা আছে ছ'মাস পর পর সেটা বদলাতে হবে–নইলে রোবট অচল হয়ে পড়বে। ঘরের এদিক-ওদিক রোবটের হাত, পা, মাথা পড়ে আছে। এক কোণে আধা নষ্ট রোবটগুলো আবার তৈরি হচ্ছে। আমিন স্ক্রু-ড্রাইভার

নিয়ে দুটো রোবটের মাথার চুল সরিয়ে দুটো স্ক্রু টাইট করে দিতেই দেখলাম, তারা প্রায় ঠিক হয়ে গেল।

সব দেখা শেষ করে আমরা বিরাট হলঘরে ফিরে এলাম। আমিন খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে একটা চেয়ারে বসল সে। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম-'খারাপ লাগছে?' মাথা নাড়ল আমিন, বলল-'না ভালো আছি।'

তারপরই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। আমিন আর থামছে না, বারবার শুধু বলছে-'না, ভালো আছি।' রেকর্ড কেটে গেলে যে রকম হয়। আমি ভীষণ থতোমতো খেয়ে গেলাম। আর কোনো কথাই বলছে না, আর থামছেও না, বারবার এক কথা বলেই যাচ্ছে। ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে বাবুর মামাকে বললাম-'আপনি এখনই আসুন, আমিন কী রকম যেন করছে।'

মামা গুরুত্বই দিলেন না আমার কথায়, চোখ তুলে বললেন- 'কোনো স্ক্রু ঢিলা হয়েছে?' কথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হলো। বললাম-'এসব কী বলছেন, আমিন যে ওদিকে প্রায় মারা গেল।' মামা এবার কিছু না বলে টেবিল থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার তুলে নিলেন-'চলো তো দেখি কী হয়েছে, যত্তসব-রোজ বলি সব স্ক্রু দেখে নেবে, জয়েন্টে জয়েন্টে তেল দেবে, ছোকরা হয়েছে বদমাইশ, কিছু শোনে না।'

আমিন তখনো ঐভাবে এক কথা বলে যাচ্ছিল। মামা গম্ভীর হয়ে বললেন-'বাহ, খুব বলছ, না ভালো আছি।' বলি বারে বারে এই এক কথা বলা কী ভালো থাকার নমুনা? তারপর আমিনের শার্ট খুলে পিঠের একটা স্ক্রু অল্প ঘোরাতেই আমিন নড়েচড়ে উঠে আমার দিকে লাজুক মুখে তাকিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। মামা হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- 'জানো না বুঝি, আমিনও একটা রোবট, রোবট দিয়েই যখন কাজ হচ্ছে, তখন আর মানুষ রাখা কেন, কি বলো?'

আমার তখন কিছু বলার ছিল না। এমনিতেই এত ঘুরে ফিরে শরীর টায়ার্ড, তার উপর একি সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড বাপু, পিলে চমকে ওঠে। আমিন তো অন্য ঘরে চলে গেল, আমি আর একা একা কী করব। আর মামা যে বিদঘুটে স্বভাবের মানুষ, তার সাথে কথাবার্তা আমার পোষাবে না। আমিনের ব্যাপারটা এমনিই আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, এখনো কেমন চক্কর খাচ্ছে সবকিছু। বাবুর মামার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সেই বিরাট হলঘর পেরিয়ে গেটের দিকে এগোতেই একটা বিরাট গাড়ি এসে থামল আমার পাশে। গাড়ি থেকে নামলেন বাবুর মামা। প্রথমটা একদম খেয়াল করিনি। তারপরেই ভীষণ চমকে গেলাম—এই লোকটা কে, বাবুর মামা তো ভেতরে, এইমাত্র বিদায় নিলে এলাম, জমজ ভাই নয় তো? ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন-'তুমিই বুঝি বাবুর বন্ধু।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে কোনোমতে মাথা নাড়লাম। 'দেখেছ তো ভালো করে সবকিছু' —ভদ্রলোক জানতে চাইলেন। আমি আবার মাথা নাড়লাম। তিনি হেসে চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললাম-'একটু শোনেন, ঠিক আপনার মতো চেহারার একজনকে দেখে এলাম ভেতরে, আবার আপনাকে দেখছি এখানে—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকেই হো হো করে হেসে ফেললেন। বললেন-'ভেতরে যাকে দেখে এলে সে তো রোবট, ঠিক আমার চেহারার রোবট বানিয়েছি কাজের সুবিধার জন্যে। আমি তো অফিসে মোটেই থাকতে পারি না, আজ আমেরিকা, কাল জাপান যাচ্ছি, তাই ওকে বানিয়ে রেখেছি। আমি যখন থাকি না, তখন কাজকর্ম ও-ই সব দেখাশোনা করে। তবে ওর একটা স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে, কী সব নীল কালি, হলুদ কালির কথা বলে।'

ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় আমি বললাম-'কিন্তু কে আসল, কে নকল, সেটা তো প্রমাণ ছাড়া কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, অবশ্য নকল জনের স্ক্রু-ঢিলা হয়ে গেলে অন্য কথা। বাবুর আসল (কিংবা নকল, কে জানে) মামা মৃদু হাসলেন- 'খুব অবাক হয়েছ বুঝি? কিন্তু পৃথিবীটা তো এভাবেই চলছে। আমরা সহজে ধরতে পারি না কে আসল, কে নকল, তাই না? অবশ্য ঠিকই বলেছ নকল জনের স্ক্রু জাতীয় কিছু ঢিলা হয়ে গেলে অন্য কথা।' বাবুর মামা থামলেন।

আমার খুব মাথা ঘুরছিল। আমি আর কিচ্ছু না বলে বেরিয়ে এলাম।

রোবোটিক কল্পকাহিনি

বন্ধু রোবট

দীপু মাহমুদ

নীলা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তার চোখ হয়ে গেছে বড়ো বড়ো। ইশকুলে রোবট আনা হয়েছে। নীলার সামনে ছয়টা রোবট। তারা দেখতে অবিকল মানুষের মতো। নীলা ঢোক গিলে বলল, 'ম্যাডাম, এরা সত্যি রোবট?'

প্রিন্সিপাল মিস সুন্দর করে হাসলেন। নীলার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ মা, এগুলো সত্যি রোবট। তারা তোমাদের বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে খেলা করবে। তবে তোমরা কখনো তাদের রোবট ভাববে না। আমাদের ইশকুলে যে রোবট আছে এই কথা ইশকুলের বাইরে কাউকে বলবে না।'

প্রিন্সিপাল মিস সবসময় সুন্দর করে হাসেন। আর মিষ্টি করে কথা বলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলার জন্য তিনি ইশকুলে রোবট নিয়ে এসেছেন। নীলার অনেক ভালো লাগছে। তবু এই কথা সে কাউকে বলবে না। প্রিন্সিপাল মিস বলতে নিষেধ করেছেন।

রোবটদের সঙ্গে তারা কী খেলা করবে নীলা জানে না। তবে রোবটগুলো খুব মজার। প্রিন্সিপাল মিস রোবটদের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছয় ঋতুর নামে ছয় রোবটের নাম রাখা হয়েছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত আর বসন্ত।

প্রিন্সিপাল মিস রোবটদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওদের সঙ্গে তোমরা খেলা করবে, গল্প করবে। ওরা অনেক সুন্দর গল্প জানে।'

নীলা বলল, 'চলো আমরা খেলি আর গান গাই।

নীলা রোবটদের নিয়ে ইশকুলের বড়ো ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ল। প্রিন্সিপাল মিস সঙ্গে এলেন। ক্লাসে ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ বসে আছে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে। নীলা ওদের সবাইকে ডাকল। কেউ তাকাল, কেউ তাকাল না। কেউ আবার দূরে সরে গেল। কাউকে তখন বিরক্ত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছে সে রেগে গেছে।

এটা অটিস্টিক শিশুদের ইশকুল। প্রিন্সিপাল মিস চেয়েছিলেন অটিস্টিক শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে পড়াশুনা করবে। তিনি সকলের জন্য একটা ইশকুল বানালেন। সেখানে অটিস্টিক শিশুদের সঙ্গে অন্য ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে চাইলেন। তখন দেখা গেল অটিস্টিক শিশু ছাড়া অন্য সবাই কোনো-না-কোনো ইশকুলে ভর্তি হয়ে গেছে।

ফারজানা মিস এই ইশকুলের ম্যাডাম। নীলা তার মেয়ে। নীলা পড়ে ক্লাস থ্রিতে। ফারজানা মিস নীলাকে সঙ্গে নিয়ে এই ইশকুলে এলেন। অটিস্টিক শিশুদের দেখিয়ে বললেন, 'মা, তুমি এদের সঙ্গে পড়বে?'

নীলা সবার দিকে তাকাল। ক্লাসভর্তি ছেলেমেয়ে। কেউ কেউ হাত দোলাচ্ছে। একজন খেলনার বাক্স সামনে নিয়ে বসে আছে। সে বাক্স উপুড় করে সবগুলো খেলনা মেঝেতে ঢেলে ফেলছে। আবার খেলনাগুলো তুলে বাক্সে ভরছে। সে বারবার একই কাজ করছে। দুটো ছেলেমেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে।

নীলা বলল, 'হ্যাঁ মা, আমি এদের সঙ্গে পড়ব।'

নীলার কথা শুনে মায়ের চোখে পানি চলে এল। তিনি নীলার মাথায় চুমু খেলেন। প্রিন্সিপাল মিস এসে নীলাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন।

প্রিন্সিপাল মিস ভাবলেন নীলা একা এতজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠবে। ওদের আরও কয়েকজন বন্ধু দরকার। যারা স্বাভাবিক আচরণ করবে। তাহলে এই ইশকুলের অটিস্টিক শিশুরাও স্বাভাবিক আচরণ শিখবে। তিনি সায়েন্স একাডেমিকে জানালেন। সায়েন্স একাডেমি এই ইশকুলের জন্য ছয়টা শিশু রোবট বানিয়ে দিল। তবে এই কথা অন্য কাউকে না জানাতে অনুরোধ করলেন প্রিন্সিপাল মিস।

রোবটগুলোর মাথার চুল, গায়ের ত্বক, চোখ সব মানুষের মতো। তবে তারা মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া করে না। তাদের শরীরে আছে হাইড্রোকার্বন। তারা বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়। হাইড্রোকার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে এনার্জি তৈরি করে। তাই দিয়ে রোবট সচল থাকে।

রোবটগুলোকে দেখে ইশকুলের ছেলেমেয়েদের অনেকে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। এরা চেনা পরিবেশ থেকে একটু অন্যরকম কিছু দেখলেই রেগে যায়। চিৎকার করতে থাকে। তবে তারা প্রিন্সিপাল মিস আর লীনার কথা শোনে। লীনা ওদের আদর করে বুঝিয়ে বলল, 'ওরা আমাদের বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে খেলব। গান গাইব, নাচব।'

কয়েকদিনেই রোবটগুলো এই ইশকুলের ছেলেমেয়েদের খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেল। ইশকুলের ছেলেমেয়েরা রোবটদের সঙ্গে সারাদিন খেলাধুলা করে, নাচে, গান গায়, ছবি আঁকে। সবচেয়ে বেশি মজা পেয়েছে নীলা। রোবটগুলো অনেক কিছু পারে। তবে তাদের বোকা বানানো খুব সোজা। যেটা তাদের ব্রেইনে নেই সেটা বললে তারা ঘাবড়ে যায়। অস্থির হয়ে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। আর বিড়বিড় করে। একজন মাথা ঝাঁকানো শুরু করলে সবকয়টা রোবট একসঙ্গে মাথা ঝাঁকায়। সবাই একসঙ্গে বিড়বিড় করতে থাকে।

সেদিন নীলা একটা রোবটকে বলল, 'আচ্ছা বলো তো, একজন মানুষ পুকুরে ডুব দিচ্ছিল কিন্তু তার চুল ভিজছিল না কেন?

প্রশ্ন শুনে রোবটদের ব্রেইনে শর্ট সার্কিট হয়ে গেল। তারা একসঙ্গে মাথা ঝাঁকাতে থাকল। আর বিড়বিড় করতে থাকল, 'একজন মানুষ পুকুরে ডুব দিচ্ছে কিন্তু তার চুল ভিজছে না কেন?'

নীলার ভীষণ হাসি পেল। সে হাসতে হাসতে বলল, 'ওই মানুষটির মাথায় কোনো চুল ছিল না। তিনি ছিলেন টাক। মাথায় চুল না থাকলে চুল ভিজবে কী করে?'

আর একটা ব্যাপারে নীলা অবাক হয়েছে। সেদিন খেলা করতে গিয়ে মিথিলা হুট করে খেপে গেল। সে হেমন্ত নামের রোবটের পায়ে কলম দিয়ে জোরে খোঁচা দিল। হেমন্তের পা কেটে গেল। তার ব্যথা পাওয়ার কথা। সে আহ, উহ কিচ্ছু বলল না। তার কাটা জায়গা থেকে রক্ত বেরুল না। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কাটা জোড়া লেগে ঠিক হয়ে গেল। হেমন্ত বলল, 'আমাদের শরীরে তোমাদের মতো রক্ত নেই। চোখের পানিও নেই। আমরা কাঁদি না। আর কোথাও কেটে গেলে আমাদের লাগে না। সেই কাটা তখুনি ঠিক হয়ে যায়।'

একদিন নীলাদের ইশকুলে কিছু দুষ্টু লোক এল। তারা ছিল পাঁচজন। তাদের গায়ে কালো কাপড়। আর মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। হাতে অস্ত্র। লোকগুলো ইশকুলে ঢুকে সবাইকে ঘিরে ফেলল। মিসদের একঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখল। আর ছেলেমেয়েদের অন্যঘরে আটকালো।

দুষ্টু লোকগুলোকে দেখে ছেলেমেয়েরা চিৎকার করতে থাকল। দুষ্টু লোকগুলো ওদের কথা শুনল না। ছেলেমেয়েরা কাঁদতে থাকল। নীলা তাদের বলল, তোমরা কেঁদো না। আমার কথা শোনো। এসো আমরা গান গাই আর নাচি।'

নীলা রোবটদের গান গাইতে-গাইতে নাচতে বলল।

রোবটগুলো নাচল আর গাইল, 'প্রজাপতি প্রজাপতি কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।'

নীলা শুনতে পেল বাইরে অনেক মানুষের হৈচৈ করছে। সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি আসছে। ছেলেমেয়েরা আবার কাঁদতে শুরু করেছে। নীলা রোবটদের বলল, 'কিছু দুষ্টু মানুষ আমাদের আটকে ফেলেছে। নিজেদের বুদ্ধি করে বাঁচতে হবে।'

কিছু দুষ্টু মানুষ কেন তাদের আটকে ফেলেছে তা রোবটগুলো বুঝতে পারল না। নীলা বলল, 'ওরা সংখ্যায় পাঁচজন। তোমরা ছয়জন। একজন এখানে আমার সঙ্গে থাকবে। ছেলেমেয়েদের ছবি এঁকে ছড়া শোনাবে। বাকিরা গিয়ে কালো কাপড় পরা পাঁচজন দুষ্টু লোককে কামড়ে-খামচে অস্থির করে দেবে। তোমরা রোবট। ওরা তোমাদের কিছু করতে পারবে না।'

গ্রীষ্ম নামের রোবট বলল, 'কামড়ে-খামচে অস্থির করতে হয় কেমন করে আমরা জানি না।'

নীলা বলল, 'আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।'

শীত নামের রোবট বলল, 'আমরা তোমার নির্দেশ মানতে পারি না।'

নীলা বলল, 'কার নির্দেশ মানবে তোমরা?

শীত নামের রোবট বলল, 'প্রিন্সিপাল মিসের নির্দেশ।'

নীলা বলল, 'এই ঘরে ছেলেমেয়ে সবাই আমার কথা শুনছে। এখন আমি এই ঘরের প্রিন্সিপাল। তাই তোমরা আমার কথা শুনবে এবং মানবে।'

এই কথা শুনে রোবটরা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তারা মাথা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করতে থাকল। বসন্ত নামের রোবট বলল, 'তুমি তোমার নির্দেশ আর কামড়ানো-খামচানো ব্যাপারটা আমাদের মেমরিতে ইনস্টল করে দাও।'

নীলা বলল, 'কীভাবে ইনস্টল করতে হয় আমি জানি না।'

বসন্ত বলল, আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি তোমার কথাগুলো বলো আর কেমন করে কামড়াতে-খামচাতে হয় আমাদের দেখাও।'

নীলা তাই করল। রোবটরা নিজেদের ভেতর কামড়ানো আর খামচানো ব্যাপারটা ঢুকিয়ে নিল।

তখন একজন দুষ্টু লোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। নীলা চিৎকার করে বলল, 'যাও তোমরা। ওদের কামড়ে-খামচে অস্থির করে দাও। বর্ষা নীলার কাছে থাকল। বাকি পাঁচজন ছুটে গেল। ওরা কালো কাপড় পরা পাঁচজন দুষ্টু লোককে কামড়ে-খামচে অস্থির করে দিল। লোকগুলোর হাতে ছুরি ছিল। আর গুলিভর্তি অস্ত্র ছিল। তারা ছুরি দিয়ে রোবটদের খোঁচা দিল। রোবটের কিছু হলো না। পাঁচজন দুষ্টু লোক অবাক হয়ে দেখল এদের শরীর কাটলে রক্ত বের হচ্ছে না। কাটা জায়গা সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লেগে যাচ্ছে।

তারা ভয় পেয়ে গেল। রোবটরা পাঁচজন দুষ্টু লোককে খুব করে কামড়াতে থাকল। তারা রোবটের কামড় খেয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

তখন একদল পুলিশ ইশকুলের ভেতর ঢুকে পড়ল। তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। তারা দুষ্টু লোকগুলোকে দুই হাত উঁচু করে দাঁড়াতে বলল। দুষ্টু লোকগুলো মেঝে থেকে উঠে পড়ল। তারা দুই হাত উঁচু করে দাঁড়াল। পুলিশ দুষ্টু লোকগুলোকে ধরে নিয়ে গেল।

পত্রিকা আর টেলিভিশন চ্যানেল থেকে অনেক সাংবাদিক এসেছিলেন। তারা রোবটের কথা জানেন না। সাংবাদিকরা রোবট বন্ধুদের সঙ্গে নীলা আর ইশকুলের ছেলেমেয়েদের ছবি তুলে নিয়ে গেলেন। দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেলে আর সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ হলো, আমাদের দেশের একদল সাহসী শিশু। কেউ লিখল, একদল অটিস্টিক সাহসী শিশু।

রোবাত

মোহাম্মদ শাহ্ আলম

ঠিক সকাল ছটায় ঘুম ভাঙে অনির। প্রতিদিন। না ভেঙে উপায় নেই। রোবাত এসে সময়মতো হাজির হবে। কানের কাছে এসে বলবে, তোমার ঘুম ভাঙিয়া যাইবার সময় হইয়াছে অনি। এখন জাগিয়া উঠুন। একবারের ডাকে না উঠলে আবার বলবে, তোমার ঘুম ভাঙিয়া যাইবার সময় হইয়াছে অনি। এখন জাগিয়া উঠুন। এবার বলবে একটু উঁচু গলায়। তারপরও না উঠলে রোবাতের গলার স্বর চড়তে থাকবে। এক সময় বাড়ি মাথায় তুলবে। বাড়ির সবাই বিরক্ত হবে। চরম বিরক্ত। তাই একবারের ডাকেই উঠে পড়ে অনি। এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে রোবাত। সাধু ভাষা, সাথে সবাইকে বলে তুমি আর ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে বলে আসুন, বসুন, যান, খান ইত্যাদি।

ঘুম থেকে উঠে হালকা ব্যায়াম করে অনি। রোবাত যেভাবে দেখায় সেভাবে। তা না হলে রোবাত তার নিজের ভাষায় বলবে, তুমি আমার মতো ব্যায়াম করুন। ব্যায়াম সেরে অনি যায় টয়লেটে, দাঁত মাজে, হাতমুখ ধোয়, তারপর পড়তে বসে। আজ পড়তে বসে কলম পাচ্ছে না অনি। টেবিলের ড্রয়ার, পেন্সিলের বাক্স, খাতার ভিতর কোথাও নেই। অংক বই খুলে বসে আছে অনি। অংক করতে পারছে না। হোমওয়ার্ক আছে। অংক না করে গেলে খাদিজা মিস দু আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল রেখে আঙুলে চাপ দিবে। কেউ বুঝতে পারবে না। অথচ ব্যথায় মরে যাবে অনি। কোনো উপায় নেই। হোমওয়ার্ক করেই যেতে হবে স্কুলে। কলম খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। ঠিক এমন সময় রোবাত এসে বলল, অনি, এই নিন তোমার কলম। তোমার জুতার ভিতর পাইয়াছি। এমনটা আরেক দিন হয়েছিল। সেদিন হারিয়েছিল ইরেজার। খুঁজতে খুঁজতে যখন নাকাল তখন রোবাত তার হাত মেলে ধরে বলে, তোমার ইরেজার হারাইয়াছেন। এই নিন। এখন থেকে যত্ন করিয়া রাখিবেন।

রোবাত। অনির প্রিয় বন্ধু। তবে মানুষ নয়। রোবট। রোবাতের কাজকর্ম দেখে কখনোই মনে হয় না ও

একটা রোবট। মানুষের চাইতেও অনেক বেশি আন্তরিক আর সহায়ক রোবাত। যখনই অনির কোনো সমস্যা হয় তা সমাধান করে দেয় রোবাত। রোবাতকে এনে দিয়েছিল অনির মামা। জাপান থেকে। মামার নাম নুরুল কাদির। অনি ডাকে নুরা মামা। এই নামটা শুনলে চরম বিরক্ত হন মামা। মামা এই ডাকটা পছন্দ করে না। ডাকলেই চরম বিরক্তি নিয়ে বলে, অনি তোকে অনেকবার বলেছি আমাকে এই নামে ডাকবি না। সবাই যে নামে ডাকে সেই নামে ডাকবি। নয়ন, নয়ন মামা। আমার ভালো নাম নুরুল কাদির নয়ন। কিন্তু অনি কখনোই এই নামে ডাকে না। মামা যেদিন জাপান থেকে ফোন করে বলেছিল, অনি তোর জন্য কী আনব। অনি বলেছিল, নুরা মামা, আমার জন্য একটা খেলনা আনবে। যে খেলনা কথা বলতে পারে। মামা সেদিন ফোনে হেসে দিয়েছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে তোর জন্য কথা-বলা খেলনা আনব। নুরা মামা যেদিন ঢাকায় আসল সেদিন অনির কী যে আনন্দ। মামা এসে প্রথমেই অনির খেলনাটা দিয়েছিল। বাক্স খুলে অনির মন খারাপ। এ কী মামা, তুমি কী এনেছ? সবই তো কতগুলো লোহালক্কড়। তখন মামা বলল, লোহালক্কড় দেখে তোর মন খারাপ হচ্ছে? আচ্ছা, তুই এই লোহালক্কড়ের কাছে মুখ নিয়ে বলত, গেট রেডি হানি। অনি তাই করে। খেলনার বাক্সের কাছে মুখ নিয়ে বেশ জোরে বলে উঠে, গেট রেডি হানি। সে কী কাণ্ড! সাথে সাথেই একটা মানুষের মতো হয়ে যায় বাক্সটি। অনি বুঝতে পারে এটা রোবট। টেলিভিশনে এ রকম রোবট দেখেছে অনি।

রোবটটা দাঁড়িয়েই কথা বলা শুরু করে, মে আই হেল্প ইউ হানি। আই ক্যান ডু এনিথিং ইউ লাইক। জাস্ট আস্ক মি। আই ক্যান ব্রিং ইওর ওয়াটার, আই ক্যান মেক ইওর ব্রেকফাস্ট, আই ক্যান প্রেস ইওর ড্রেস। মামা অনিকে বলে দেয় সে কী কী বলছে। অনিও অনেক কথা বুঝতে পারে। ক্লাস ফাইভে পড়ে অনি। অনেক ইংরেজি শিখেছে। তবে কিছু কিছু বুঝতে পারে না। যেমন সেদিন বুঝতে পারেনি, আই ক্যান প্রেস ইওর ড্রেস-এর মানে কী। মামা বলে দিয়েছিল, এর মানে সে তোর জামা ইস্ত্রি করে দিতে পারবে। মামা আরো বলেছিল, তুই চাইলে রোবট তোর মতো বাংলায় কথা বলবে। শুধু একটা কাজ করতে হবে। কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে বাংলা ভাষার প্রোগ্রাম সেট করে দিতে হবে। অনির অনুরোধে মামা তাই করেছিল। অনি ওর একটা নামও দিয়েছিল, রোবাত। সেই থেকে রোবাত বাংলায় কথা বলে। তবে অদ্ভুত বাংলা। অনির ভালোই লাগে রোবাতের বাংলা বলা।

আজ ছুটির দিন। দুপুরের পর থেকে রোবাতকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও নেই। বাসার সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। নেই তো নেই। রোবাত তো একা কোথাও যায় না। কোথায় গেল রোবাত। অনির মন ভীষণ খারাপ হয়। অনির মায়েরও মন খারাপ। রোবট হলে কী হবে! কত সুন্দর করে কথা বলে সে। অনির সব কাজ মনে করিয়ে দেয়। কোনো কিছু হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করে দেয়। মামা শুনে বাসায় আসে। মামারও মন খারাপ হয়। মামা বের হয় আশপাশে খোঁজ করতে। অনির মা-ও যায় আশপাশের বাসায়। বাবা অফিস থেকে এসেই বেরিয়ে পড়ে। একদিন অনির স্কুলে গিয়েছিল রোবাত। সেখানে যেতে পারে। বাসার কাছেই স্কুল। অনির বাবা স্কুলের দিকে যায়।

রোবাতকে পাওয়া গেছে। স্কুলের গেটে বসেছিল। অনির বাবাকে দেখে রোবাত এগিয়ে আসে। কোনো কথা বলে না। একসাথে বাসায় আসে। বাসায় এসে অনির মায়ের কাছে যায় রোবাত। অনির কাছে যায় না।

অনির মামা রোবাতকে জিজ্ঞেস করে তুমি কেন স্কুলে গিয়েছিলে রোবাত?

আমি বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম অনির শিক্ষককে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে।

কী কথা?

কথাটি হইল, অনির বিদ্যালয়ে কী মা-বাবার সাথে ঝগড়া করিতে শিখাইয়া থাকে।

কেন?

কেন আবার, আজ অনি তার মায়ের সাথে ঝগড়া করিয়াছেন। ইহা ভালো নয়। অনি যদি মা-বাবার সাথে রাগারাগি বা ঝগড়া করে তাহা হইলে আমি আর এই বাসায় থাকিব না।

এ কথা শুনে অনির মন খারাপ হয়। অনি মাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর রোবাতকে আদর করে। অনি বলে, না, রোবাত তুমি যাবে না। তুমি এ বাসাতেই থাকবে। আমার সাথে। সব সময়।

আমিও তোমার সাথে থাকিতে চাই অনি। সবসময়।

রোবোটিক কল্পকাহিনি

তিতির বন্ধু

নাসরীন মুস্তাফা

তিতির ছোটো চাচা ইন্তি এখন খুব ব্যস্ত। জাপানের সনি কোম্পানির হয়ে রোবট তৈরি করছে ইন্তি আর ওর টিম। বাংলাদেশে বসে সনি কোম্পানির চাহিদা মতো রোবট বানানো হচ্ছে। বানানো হয়ে গেলে টিভি-ফ্রিজের মতোই বাক্সবন্দি হয়ে চলে যাচ্ছে জাপানে। সনি কোম্পানি চুক্তি মতো ইয়েন পাঠিয়ে দিচ্ছে ইন্তির অ্যাকাউন্টে।

ইয়েন হচ্ছে জাপানের টাকা।

নানারকমের রোবট তৈরি করছে ইন্তির টিম। খেলনা রোবট। কাজের রোবট। দাম পড়ছে বেশি। ফলে এখনো বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না এগুলো। ইন্তি ঠিক করেছে, সনি-র সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে দেশের মানুষদের জন্যই সস্তায় রোবট বানাবে।

তিতির বাবা অর্থাৎ ইন্তির বড়ো ভাই হাসতে হাসতে বলল, বাংলাদেশে এত মানুষ! আর কদিন পর একজনের ঘাড়ে আরেকজন চড়ে বসবে। পা ফেলার জায়গা থাকবে না। এরমধ্যে তুই যদি রোবট নামাস, মানুষ তোকে পেটাবে।

তিতির মা মুখ ঝামটা মেরে বলে, মানুষ তো দেখিই। কিন্তু কাজের বেলায় কোনো মানুষ নেই। অফিস করে সংসারের সব কাজ করতে হচ্ছে। সাহায্য করার জন্য কত মানুষকে যে বললাম, অনেক টাকা দিতে চাইলাম। রাজি হয় না।

ইন্তি মনে করিয়ে দেয়, মানুষ রাখার কথা আর বলো না। মনে নেই সে কথা? তিতি তখন ছোট্ট। এক বুয়া তিতিকে কোলে করে ভিক্ষে করতে যেত। তিতি সোনাটার কত কষ্ট হয়েছিল!

তিতির মা বলে, এখন তো আর তিতি ছোট্ট নেই। ওকে কোলে করে ভিক্ষে করতে এখন কেউ পারবে না।

ইন্তি মানে না। তা না পারুক। তিতি খুব বেশি বড়ো হয়ে যায়নি। পত্রিকায় দেখো না? ছোটো বাচ্চাদের অপহরণ করা হচ্ছে। দরকার নেই এসব রিস্কে গিয়ে।

মা রেগে বলে, একজন খারাপ বলে কী সবাইকে সন্দেহ করবি? আমি যে খাটতে খাটতে বুড়ি হয়ে যাচ্ছি, তা তো তোর চোখে পড়ে না। আমার জন্য তো তোর কোনো মায়া নেই। যদি থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই তুই এভাবে ভাবতে পারতিস না। আমাকে সাহায্য করার জন্য মানুষ যোগাড় করে দিতে চাইতি। নিজে তো একটা কাজও করিস না। খালি বড়ো বড়ো কথা!

তিতি ওর ঘরে বসে পড়ছিল। মায়ের গলা কানে গেলে ও নিজেও অবাক হয়ে যায়। মা এত জোরে কথা বলছে কেন? তিতি উঠে এল এ ঘরে। সব শুনে তিতি কিন্তু মায়ের পক্ষই নিল। ঘোষণা দিল, আজ থেকে সবাই সবার কাজ করবে। খাবার শেষ করে প্লেট রেখে উঠে যাওয়া চলবে না। যার যার প্লেট, যার যার কাপড় সে সে ধোবে।

রান্না? বাবা ভয়ে ভয়ে জানতে চায়, রান্নাটা তো আমরা কেউ পারি না। শুধু তোর মা পারে।

শিখতে হবে। এক সপ্তাহ সময় দিলাম। রান্না শিখে ফেলো। তিতির সাফ জবাব।

কীভাবে!!! ইন্তি আর তিতির বাবা কাঁদো কাঁদো স্বরে জানতে চায়। আহা, টিভিতে আজকাল কত রান্নার অনুষ্ঠান দেখায়। সেসব দেখলেই তো শিখে ফেলা যায়। কেবল খবর আর টক-শো দেখলে তো হবে না বাবা। আমি ছোটো মানুষ, আমিই তো কত রান্না পারি।

ইন্তির মুখ হা হয়ে যায় এ কথা শুনে। খুশি হয় কম না। তিতি সোনা রান্না করতে পারে! কী কী রান্না করতে পারিস, মা? তুই কি তুনা খিচুড়ি রান্না করতে পারিস? সাথে ডিম ভাজি? তোর মা তো আর করবে

না। তুই করিস, তাহলেই আমার খাওয়া হবে। নাহলে বৃষ্টির দিনে আমার চলবে কী করে?

তিতি হাসে ইন্তির কথা শুনে।

মা-ও হাসে। বলে, রান্না কোনো কঠিন কাজ নাকি? তিতি সোনা তো টিভি দেখে, ইন্টারনেট থেকে তথ্য নিয়ে, পত্রিকায় পড়ে নানান মজাদার আইটেম তৈরি করা শিখে ফেলেছে। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। তোমাদের মতো কুঁড়ের বাদশা নাকি আমার মেয়েটা? লেখাপড়ার পাশাপাশি মা-কে সাহায্য করে।

বাবা কিন্তু গম্ভীর। মুখ কালো করে বলে, আমার মেয়েটার যদি হাত কেটে যায়! যদি হাতে গরম লাগে? ওর কষ্ট হয় না? কেন ওকে খাটাও? এইটুকুন মাত্র সংসার, তা-ও যদি আমার মেয়েটাকে কষ্ট করতে হয়!

বাবার মন খারাপ। প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। কিন্তু তিতি পারল না বাবার এরকম অদ্ভুত কষ্টে সাড়া দিতে। কাজ করলেই না শেখা যায়। তিতি তো কাজ করতে খুব ভালোবাসে। মা-কে সাহায্য করতে ভালোবাসে। বিশেষ করে, মা আর ও রান্নাঘরে গল্প করতে করতে কাজ করে। ঐ সময় তিতির খুব ভালো লাগে। মা সবসময়ই ওর বন্ধু। তখন যেন আরো বেশি করে বন্ধুত্ব হয় ওদের। মা ওর কাছ থেকে নতুন নতুন রান্নার আইডিয়া শিখে নেন। ও মায়ের কাছ থেকে শেখে, মা নানির কাছ থেকে রান্নার কোন বুদ্ধিটা শিখেছিল।

বাবার মন খারাপের জবাবে এরপর তিতির মা যত রকমের অভিযোগ করল, তার একটিও মিথ্যে নয়। তিতির বাবা অফিস থেকে ফিরে নিজের কাপড়টা পর্যন্ত ঠিক জায়গায় রাখে না। পায়ের উপর পা তুলে বিছানায় শুয়ে পত্রিকা পড়ে। এরপর টিভি দেখতে বসে। খাবার দিতে বলে বারবার। টেবিলে খাবার দেওয়া হলে নিজের মতো খেয়ে আবার টিভির সামনে বসে। তিতির মা যদি কোনো কাজের কথা বলে, তাহলে তার মেজাজ গরম হয়ে যায়। সারাদিন কাজকর্ম করে অনেক টায়ার্ড, এরপর আবার কিসের কাজ? তিতির মা মনে করিয়ে দেয়, সারাদিন অফিসে কাজকর্ম করতে হয় তাকেও, টায়ার্ড হতে হয় তাকেও। তখন বাবা বলে, ওহ্, আমি কী সংসারের কোনো কাজ জানি? এসব তো মেয়েদের ব্যাপার।

তিতি গম্ভীর হয়ে বলে, কাজ তো কাজই। ছেলেদের কাজ-মেয়েদের কাজ বলে কোনো কথা নেই। ছেলেদের খিদে লাগে। মেয়েদের লাগে না?

ইন্তি অবাক হয়ে বলল, তিতি সোনা তো দারুণ কথা বলল! ভাইয়া, শুনেছ? ও কিন্তু দুর্দান্ত একটা কথা বলেছে। আসলেই তো আমার খিদে পায়, তোমার খিদে পায়। ভাবিরও তো খিদে পায়। কিন্তু...

মা ইন্তির কথা শেষ করে দেয়। কিন্তুটা কি, জানিস না?

জানি। ইন্তি মাথা নিচু করে বলে, আমরা খিদে পেলেই তৈরি করা খাবার পাই। তুমি কষ্ট করে আমাদের খিদে মেটানোর ব্যবস্থা কর। কিন্তু, তোমার খিদে পেলে আমরা কিছুই করি না। তোমার খাবার তোমাকেই বানিয়ে নিতে হয়।

ইন্তি লজ্জা পাচ্ছে। তিতির বাবা মিনমিন করে বলতে চাইছিল, বাজার তো আমিই করি। পরক্ষণেই মনে পড়ল, তিতির মা-ও অফিস থেকে ফেরার সময় বাজার করে আনে। কাজেই, সংসারের এমন কোনো কাজ নেই, যা তিতির মা করে না। আর সংসারের এমন কোনো কাজ নেই, যা কেবল তিতির বাবা করে।

ইন্তি মাথা নিচু করে বলে, ছি!

তিতি তখন ওর চাচা-কে আদর করে বলে, মন খারাপ করো না। আজ থেকে তুমিও সাহায্য করতে চেষ্টা করবে। তিতির মা আর কথা বাড়ায় না। অনেক কাজ পড়ে আছে। উঠতে উঠতে বলে, আজ থেকে অন্তত জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে খাওয়ার চেষ্টাটা শুরু করো। বাকি সব পরে দেখা যাবে।

এত বড়ো অপমান! ইন্তি এবং তিতির বাবা দুজনেই জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে উদ্যোগী হলো। দুজনেই পারল না ঠিকমতো কাজটা করতে। আশ্চর্য! পানি ঢালতে গিয়ে একটু হলেও টেবিলে পানি পড়ে গেল। এই কাজটাকে কোনোদিনই কঠিন মনে হয়নি। আজ হাতে-কলমে করতে গিয়ে বুঝতে পারল, কোনো কাজই ছোটো না। প্র্যাকটিস না করলে কোনো কাজেই এক্সপার্ট হওয়া সম্ভব না।

একদম ঠিক কথা। রোবট বানাতে এক্সপার্ট ইন্তি জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে পারে না। কেন? প্র্যাকটিস নেই। এখন থেকে ইন্তি নিয়মিত ঘরের কাজ করার প্র্যাকটিস করবে। আর ভুল করা চলবে না।

দুদিনের মাথায় ইন্তি নিজের ভেতর অনেক আলসেমি টের পেল। গ্লাসে কেন সব সময় পানি ভরা থাকে না? পানি খাওয়ার সাথে সাথে গ্লাস কেন আপনা আপনি আবার পানিতে ভরপুর হয়ে ওঠে না? টেবিলে বসে ইন্তি চোখ বুঁজে ভাবে, আহা, এখন যদি জুয়েল আইচ আসতেন! দু' আঙুলে তুড়ি বাজাতেই গ্লাস ভরে উঠত পানিতে, আর ও আরামসে খেত। আহা, এমন কেন

হয় না? কেন খেটে খেতে হয় এই পৃথিবীতে? কেন কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না?

তিতির মা বাঁকা হাসি হাসে এই অলসদের দেখে। এই হাসি সহ্য হয় না। তিতির বাবা অসহায়ের মতো ভাইয়ের হাত চেপে ধরে বলে, রুম্পার হাসিটা আজকাল অসহ্য ঠেকছে। এই হাসি ঠেকাতে কিছু একটা কর ভাই। তুই না বিজ্ঞানী? তোর না অনেক বুদ্ধি?

তিতি দেখল, মানুষের মতো মাথা-হাত-পা-চোখ আছে। কিন্তু এ মানুষ নয়। তিতি বিস্ময় আর আনন্দ নিয়ে ইন্তির কাছে জানতে চায়, এটা কি একটা রোবট?

ইন্তি মাথা নাড়ে। রোবট। যন্ত্র। যন্ত্রমানব। মেশিন।

ও!

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাখা রোবটটার শরীর ঠান্ডা। স্টিলের কোনো কিছু ছুঁয়ে দিলে যেরকম ঠান্ডা লাগে, সেরকম।

তুমি বানিয়েছ? চা, এটা তুমি বানিয়েছ?

হু। না বানিয়ে উপায় কী? আমি যে ঘরের কাজ করতে পারি না। আমার হয়ে ও ঘরের সব কাজ করে দেবে।

স...ব কাজ?

হু। জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালা থেকে শুরু করে রুটি বেলা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, টয়লেট পরিষ্কার করা, কাপড় সাফ করা, রান্নাবান্না-----স----অ---ব!

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন ইন্তি। ওদের নিজেদের জন্য এই রোবটটা বানিয়েছে ও। ভাবির কষ্ট কমবে, ভাবির মুখের বাঁকা হাসি উধাও হবে। ইন্তি নিজের উপর এত খুশি হলো যে বলার নয়।

খুশি ওরা সবাই হলো। রোবটটার পিঠের মাঝখানে সুইচ। ওটা অন করতেই আলো জ্বলে উঠল দুই চোখে। হালকা মোলায়েম নীল আলো। এতেই বদলে গেল রোবটটার চেহারা। কেমন কোমল শান্ত ভাব ফুটে উঠেছে ধাতব মুখটাতে। তিতির মনে হলো, দেখতে যেমনই হোক, একে পুরোপুরি যন্ত্র মনে হচ্ছে না। ইন্তি বলল, টিভি-ফ্রিজ-ওয়াশিং মেশিনের মতোই এটাও সেরকম একটা যন্ত্র। ঘরের কাজে সাহায্য করবে। তিতির মনে হচ্ছে, এ ওদের সংসারের নতুন অতিথি। ওদের সাথে থাকবে। তিতির অনেক ভালো লাগল এসব ভেবে।

ওকে আমি মিনা বলে ডাকব। ও আমার বন্ধু মিনা।

তিতি জড়িয়ে ধরে রোবটটাকে। তিতির কাণ্ড দেখে খুব হাসে সবাই। ইন্তি বলে, এটা স্রেফ একটা যন্ত্র তিতি সোনা। কথা-টথা বলবে না। কেবল কাজ করবে। ও কাজের আদেশ বুঝতে পারে। যা করতে বলা হবে, সেটা করতে পারবে।

তিতির মা খুশি এ কথা শুনে। বেশ তো! মুখে মুখে তর্ক করবে না। বেয়াদবি আমি একদম পছন্দ করি না।

তিতির ভালো লাগে না। মিনা কথা বলবে না। কেবল কাজ করবে। বেশি কাজ করে ওর যদি কষ্ট হয়, ও কি তবুও উহ্ করতে পারবে না?

না। দরকার কী? ও তো যন্ত্র। কষ্ট নামক বিষয়টি মানুষ বোঝে। যন্ত্র বোঝে না। কাজেই, ওর উহ্ করার কোনো দরকারই পড়বে না।

কষ্ট হলেও যদি সেটা বুঝতে না পারে, তা হলে কী আরো কষ্ট হবে না? তিতির এই প্রশ্ন ওরা কেউ বুঝতে পারে না। বুঝতে চায়ও না। আপাতত বিরাট একটা সমস্যার সমাধান করা গেছে, এতেই সবাই খুশি।

কেবল একা তিতির মন খারাপ। মিনা সারাক্ষণ কাজ করছে। মা মুখে যা বলছে, সাথে সাথে সেটা করতে ছুটে যাচ্ছে। কাজ শেষ হয়ে গেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মা ইন্তিকে বলেছিল, কী কী করতে হবে তা

একবারে বলে দিলেই তো ভালো হয়। ও ওর মতো শেষ করে ফেলবে।

তা-ই হলো। মিনার বুকের ভেতরে কী সব বোতাম-টোতাম টিপে টিপে ইন্তি সব কাজের প্রোগ্রাম সেট করে দেয়। ভোর চারটা থেকে শুরু করে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজের প্রোগ্রাম- একটার পর আরেকটা। এর ফলাফল হলো দুর্দান্ত রকমের। মা কিছুই বলেন না। কিন্তু মিনা ভোর চারটা থেকে শুরু করে কাজ। ঝকঝকে তকতকে হয়ে যায় ঘরবাড়ি। কাপড় ধুয়ে-শুকিয়ে ইস্ত্রি করে ভাঁজ করে আলমারিতে ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখে। সকালের নাস্তা, দুপুরের লাঞ্চ, রাতের ডিনার হয় ফাইভ স্টার হোটেলের মতোই নানান স্বাদের, নানান মজাদার মেন্যুর। অসংখ্য খাবারের মেন্যু সেট করা আছে মিনার বুকের ভেতরকার বোর্ডে।

ঠিক রাত এগারোটার সময় মিনা সুইচ বোর্ডের সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে যায়। ওর সব কাজ শেষ। তখন বাবা ওর পিঠের পেছনে থাকা চার্জার প্লাগে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘুমাতে যান। চার্জ শুরু হওয়া মাত্র মিনার চোখের আলো নিভে যায়। আর ঠিক তক্ষুণি বুকের ঠিক মাঝখানে জ্বলে ওঠে লাল আলো।

তিতির মনে হয় মিনার বুকে কষ্ট হচ্ছে। কষ্টের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে ওর বুক। বাবা-মা মোটেও বোঝে না এসব। তিতিকে ঘুমোতে তাড়া দেয়। কাল সকালে স্কুল আছে।

স্কুলে গেলেই ভালো থাকে তিতি। মিনার কষ্ট ওকে দেখতে হয় না। বন্ধুদের সাথে গল্প-গুজব করতে করতে আর পড়ার চাপে সময় কেটে যায় ওর। বন্ধুদের কাছে মিনাকে নিয়ে গল্প করতে চায় তিতি। কিন্তু, কী গল্প করবে? মিনার কোনো কথা নেই। ওর কাজের গল্প করতে তিতির ভালো লাগে না।

তিতির মা-র কিন্তু মিনার কাজের গল্প করতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু ইন্তি বলেছে, এসব নিয়ে হইচই হতে পারে। পত্রিকাওয়ালারা একবার খবর পেয়ে গেলে ছবি-টবি তুলে একাকার করে দেবে। মিনার মতো রোবট পৃথিবীর নানান দেশে তৈরি হচ্ছে। ওখানে কেউ আর অবাক হয় না এসব খবরে। কিন্তু, বাংলাদেশের জন্য এ-তো নতুন খবর। মানুষজন হজম করতে পারবে না। ইন্তির এসব হই-হুল্লোড় তৈরি করতে ভালো লাগে না। এর চেয়ে মিনার কাজটা হচ্ছে, হোক না। তিতিদের সংসারে দারুণ আরাম সবার, থাক না ওরকম।

কিন্তু বললেই তো আর চেপে রাখা যায় না সব কথা। আজকাল মিনার মা রুম্পা শারমিন অনেক সাজুগুজু করে অফিসে যায়। প্রতিটি কাজ করে অনেক মনোযোগ দিয়ে। দুপুরের লাঞ্চ ব্রেকে সহকর্মীদের জন্য নিত্য নতুন খাবারের বাক্স খুলে সারপ্রাইজ দেয়। শপিং করতে বের হয়। গল্পের বই পড়ে। পছন্দের ফিল্ম দেখতে দেখতে কফির কাপে চুমুক দেয়। তিতির বাবার সাথে রাজনীতির ভালো-মন্দ নিয়ে তর্ক করে। কোনো তাড়াহুড়া নেই, ছোটোবেলার মতো শান্ত-মিষ্টি স্বভাবের রুম্পাকে আবার ফিরে পাওয়া গেল। ব্যাপারটা নজরে পড়ল অনেকেরই।

অফিসের বস কাজ বলতেই বোঝে রুম্পা শারমিনকে। ফলে মাস দুয়েকের মধ্যেই প্রমোশন হয়ে গেল। এতে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে খাক হলো রুম্পার সহকর্মী নজর আলী। বসকে প্রতিদিন তেল দিতে ব্যস্ত থাকত লোকটি। অফিসের সবাই জানত, বসের ডান হাত সে। বস তাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না। প্রমোশন তো নজর আলীরই হবে, এরকম জানত অফিসের সবাই, অফিসের টেবিল-চেয়ার পর্যন্ত। অথচ প্রমোশন হলো কি না রুম্পা শারমিন নামের কেবল হাসতে জানা মেয়েটার!

বাড়ি ফিরে তিতির মা সবাইকে জানালো খুশির খবরটি। এই প্রমোশন যে মিনার জন্যই হয়েছে, এটাও বলতে ভুলল না। খুশিতে তিতির মা মিনার কাছে গিয়ে থ্যাংক ইউ পর্যন্ত জানালো। মিনা কিছু টের পেয়েছে বলে মনে হলো না। ওর মতো ও কাজ করেই চলেছে। তিতির যদিও মনে হলো, মিনার চোখের নীল আলো কেঁপে উঠেছে হঠাৎ। বেচারি কখনো থ্যাংক ইউ শোনেনি। আজ হঠাৎ এরকম শুনে ধাক্কা খেয়েছে। বারবার শুনলে হয়ত বুঝতে পারবে, ওর কাজকে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে এ বাড়ির সবাই। তখন নিশ্চয়ই ও অনেক খুশি হবে।

গরমের ছুটি এসে গেল তিতির। এখন ও সারা দিন বাসায় থাকে। আগে তিতি একা বাসায় থাকত, আর মা দুশ্চিন্তা করত অফিসে বসে। এখন আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। মিনা আছে তিতির সাথে। কথা না বলতে পারুক, সাথে তো আছে।

তিতি ইন্তির কাছে আবদার করেছিল, মিনাকে কথা বলতে শিখিয়ে দাও না চাচা।

ইন্তি বলেছে, কী দরকার? ও কথা বললে তোর কথা বলার চান্সটা কমে যাবে না? তার চেয়ে তুই বল, ও শুনুক।

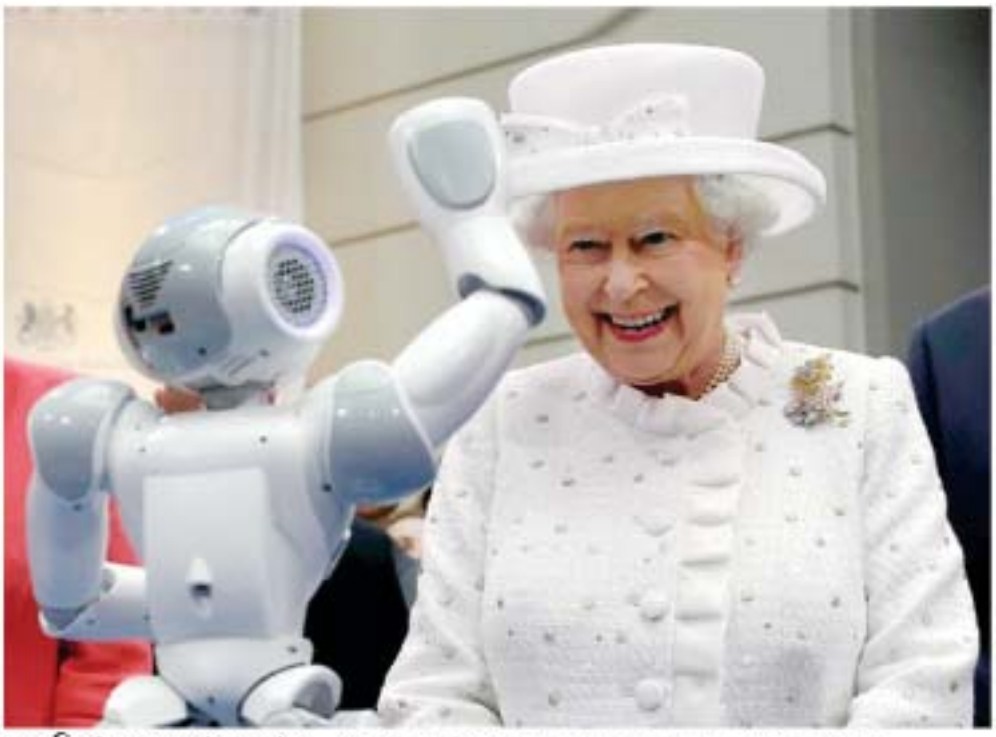

শোনে না তো। খালি কাজ করে।

ইন্তি ব্যস্ততার মাঝে অত কিছু শুনতে পারেনি। কেবল বলেছে, কাজই তো ভালো। জ্ঞানীগুণীরা বলে গেছেন, কাজ করো। কাজেই মুক্তি।

তিতি আসলে বুঝতে পারছিল, মিনাকে একটা যন্ত্র ছাড়া ওরা আর কিছুই ভাবছে না। কেবল তিতির কাছেই মনে হয়, মিনার অনেক কষ্ট। ও মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করছে। বিশেষ করে রাতে যখন চার্জ দেওয়া হয়, ওর বুকের মাঝখানে জ্বলে ওঠা লাল আলোর বিন্দু তিতিকে অস্থির করে তোলে। ওর খুব মায়া হতে থাকে মিনার জন্য।

এক রাতে ও আর পারল না। ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। বাবা-মা ঘুমিয়ে গেলে আস্তে উঠে এল। চার্জার খুলে আনল প্লাগ থেকে। নিভে গেল লাল আলো। তিতির মনে হলো, অন্ধকারে চুপ হয়ে থাকা মিনা ফিসফিস করে ওকে বলল, থ্যাংক ইউ।

সকালে লেগে গেল হুলস্থুল। মিনা কোনো কাজ করেনি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। নাস্তা তৈরি হয়নি। ঘরদোর এলোমেলো। তিতির স্কুল নেই বলে একটা বিপদ কাটানো গেল। কিন্তু বাবা-মা তো অফিসে যাবে। ইন্তির আজকে খুব জরুরি একটা মিটিং আছে। সকাল সকাল বেরুতে হবে। এখন উপায়?

তিতি ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। বলল, কোনো দুশ্চিন্তা করো না। আমি তোমাদেরকে নাস্তা বানিয়ে খাওয়াচ্ছি।

তিতির মা আরেকটু পর মনে হয় কেঁদেই দেবে। ইন্তিকে বলে, অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। এত আরামে থাকাটা আমার পোষালো না রে!

ইন্তি মিনাকে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। বলল, তুমি ভেবো না। যন্ত্রটাকে ঠিক করে ফেলছি এক্ষুণি। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইন্তি টের পেল, মিনার শরীরে চার্জ নেই। তাই ও কাজ করছে না। ইমারজেন্সি পাওয়ার অন করে দ্রুতগতির প্রোগ্রাম সেট করল। অন্তত দ্রুততম সময়ে নাস্তার ব্যবস্থা হয়ে যাক। এরপর মিনাকে ঠিকমতো চার্জে দিতে হবে। চার্জ ঠিকমতো হলেই এটা কাজ করবে।

দ্রুততম সময়েই নাস্তা বানিয়ে ফেলল মিনা। তিতির রাগ হচ্ছিল খুব। কী হতো, আজ মিনাকে বিশ্রামে থাকতে দিলে? এটুকুও পেল না বেচারি।

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর তিতি তাই মিনার চার্জার খুলে ফেলল। আবার নিভে গেল বুকের লাল আগুন। তিতি মিষ্টি করে হাসল মিনার দিকে তাকিয়ে। মিনার ঠান্ডা স্টিলের গালে হাত রেখে বলে, বন্ধুকে মুখে মুখে থ্যাংক ইউ দিতে হয় না। তুমি মনে মনে দাও, আমি ঠিক ঠিক টের পাই। সব কথা কী মুখে বলতে হয়? ভালোবাসা তো আমরা মনে মনেই টের পেয়ে যাই। তাই না?

বিকেল বেলা। মা-ই প্রথম দেখলেন ঘটনাটা। বাবা আর ইন্তি জরুরি ফোন পেল মায়ের কাছ থেকে। বাড়ি ফিরে এল ওরা। খুব তাড়াতাড়িই এল।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। তখনো ঘুম ভাঙেনি তিতি সোনার। মিনা কাত হয়ে শুয়ে আছে তিতির পাশে। মিনার দিকে কাত হয়ে আছে তিতি। মিনার একটা হাত তিতির পিঠের উপর রাখা। এই প্রথম ওদের মনে হলো, মিনা একটি যন্ত্র না।

দেখে মনে হচ্ছে, মিনা যেন তিতিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘুমপাড়ানি গান কী গেয়েছিল? মুখে মুখে না হোক। মনে মনে? তিতির মুখে লেগে থাকা মিষ্টি হাসিটা দেখে ওদের কিন্তু সেরকমই মনে হতে থাকে।

খালি বিয়ারের মগটার দিকে একবার তাকাল মাইক ডোনোভান। মেজাজ খিচড়ে গেল তার। অনেকক্ষণ ধরে তাদের কথা শুনছে সে, এবার কিছু বলতে হয়। চেঁচিয়ে বলল সে, 'তোমরা যদি অন্যরকম রোবটের কথা বলো, তাহলে আমি এমন রোবট দেখেছি যে রোবট প্রথম সূত্র মেনে চলে না।'

এই অসম্ভব কথাটা শুনে, সবাই তার দিকে ঘুরে তাকাল।

ডোনোভান বুঝতে পারল মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছে, তাই প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করা দরকার। 'আমি গতকালই একটা ভালো গল্প শুনেছি', সে বলল অন্তরঙ্গ গলায়, 'এটা ছিল—'

ডোনোভানের পাশে বসা ম্যাকফারলেন বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ তুমি এমন রোবট দেখেছ যে মানুষের জন্য ক্ষতিকারক? এর মানে হলো প্রথম সূত্র না মানা।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই', ডোনোভান বলল। 'হ্যাঁ যা বলছিলাম, কালকে যে গল্পটা—'

'খুলে বলো পুরোটা,' ম্যাকফারলেন আদেশের সুরে বলল। অন্যরা টেবিলে বিয়ারের মদ ঠুকে সম্মতি জানাল। ডোনোভান বলতে শুরু করল, 'দশ বছর আগে টাইটানে ঘটনাটা ঘটেছিল,' সে বলল। দ্রুত চিন্তা করল, তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ, পঁচিশ-ই হবে। আমরা সবেমাত্র বিশেষভাবে নির্মিত তিনটি রোবটের চালান গ্রহণ করেছি। রোবটগুলো টাইটানের আবহাওয়া অনুযায়ী তৈরি। ওগুলো এম এ মডেলের প্রথম সংস্করণ রোবট ছিল। আমরা ওদের এমা-ওয়ান, টু এবং থ্রি বলে ডাকতাম।' আরেক মগ বিয়ারের অর্ডার দিল হাতের ইশারায়। ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে রইল ব্যগ্র দৃষ্টিতে। দেখা যাক এরপর কি আসে?

ম্যাকফারলেন বলল, 'আমি আমার জীবনের অর্ধেকটা সময় রোবোটিক্স নিয়ে কাটালাম, মাইক আমি এম এ মডেলের এমন রোবটের কথা শুনিনি।'

'শোনো নি কারণ, এম এ মডেলের রোবট উৎপাদন প্রথম চালানের পর পরই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—যে চালানটির কথা আমি বলছিলাম। তোমার কি মনে নেই।'

'না।'

ডোনোভান আবার মূল গল্পে ফিরে গেল। 'রোবটগুলো আসার সাথে ওদের কাজে লাগিয়ে দিলাম। তুমি তো জানো, ঝড়ের সময় আমাদের বেসে কোনো কাজকর্ম থাকে না। টাইটানে ঝড় আবার বছরের আশিভাগ সময় জুড়ে থাকে। তুষারের সময় একশো গজ দূরের বেস খুঁজে পাওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কম্পাসও কোনো কাজে লাগে না, কারণ টাইটানে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই।

'এমতাবস্থায় এম এ রোবটগুলো পেয়ে আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নতুন এক ধরনের ভাইব্রো-ডিটেক্টর থাকাতে রোবটগুলো যে-কোনো পরিস্থিতিতে বেসে ফিরে আসতে পারত সহজেই। এর মানে খনিজ পদার্থ খোঁজাটা ওদের জন্য সহজ ছিল। উঁহু ম্যাক, কোনো কথা বলবে না। ভাইব্রো-ডিটেক্টরও বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, এবং এ কারণে তুমি ওদের কথা শোনোনি।' ডোনোভান একটু কাশল। 'মিলিটা সিক্রেট, তাই খবরটা চাউড় হয়নি।'

সে বলে চলল। 'প্রথম ঝড়ের সময় রোবটগুলো ভালোভাবেই কাজ করে গেল এবং ঠিক শান্ত সময় এমা-টু গন্ডোগোল শুরু করল। ঘুর ঘুর করে ঘুরত, এদিক ওদিক ঢুকে পড়ল এবং পটিয়ে পটিয়ে, তাকে সেখান থেকে বের করে আনা হতো। শেষে একদিন সে বেসের আশপাশে ঘুরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। আমরা ভাবলাম তৈরি করার সময় কোথাও সমস্যা রয়ে গেছে অন্য দুটোর তুলনায়। এর মানে হলো আমাদের সাহায্যের হাত কমে গেল, রোবটও

কমে গেল। তাই আমরা ঠিক করলাম শান্ত সময়ে আমাদের একজনকে কর্ণস্কে যাওয়া উচিত। আমি রোবট ছাড়া যেতে রাজি হলাম। এখন তো শান্ত সময়। দুই দিনের মধ্যে ঝড় শুরু হবে না। বিশ ঘন্টার ভেতর ফিরে আসতে পারব।

'আমি যখন ফিরে আসছিলাম,–দশ মাইল দূরে বেস–তখন দমকা বাতাস সহ ঝড় শুরু হয়ে গেল। বাতাস ভারি আসতে শুরু করল। আমি আমার এয়ারকার মাটিতে নামিয়ে ফেললাম যাতে ঝড়ো বাতাস ওটাকে মাটিতে আছড়ে ফেলতে না পারে। আমি বেস লক্ষ্য করে দৌড় দিলাম। মাধ্যকর্ষণ শক্তি কম ছিল বলে দূরত্বটা দৌড়ে পার হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি কি সোজা দৌড়তে পারব তো? এটাই তখন বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল। আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস সরবরাহ ছিল পর্যাপ্ত এবং স্যুট গরম রাখার কয়েলগুলো ঠিকমতোই কাজ করছিল। কিন্তু টাইটানের ঝড়ে দশ মাইল পথ পাড়ি দেওয়াটা সহজ কথা নয়।

'তারপর যখন তুষার বৃষ্টিতে চারিদিকে অন্ধকার নেমে এল, এমনকি অন্ধকারের শনিগ্রহও দেখা যাচ্ছিল না এবং সূর্যও দেখা যাচ্ছিল না, ঠিক তখন আমি শক্ত হয়ে ঝড়ের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সামনে কিছু একটা নড়তে দেখলাম। আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম না, তারপরেও আমি নিশ্চিত ছিলাম ওটার সম্পর্কে। ওটা একটা ঝোড়ো কুকুর। টাইটানের একমাত্র জীবিত প্রাণী যা ঝড়ের ভেতর চলাফেরা করতে পারে। এমনকি হিংস্রও বটে। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার স্পেস স্যুট আমাকে রক্ষা করবে না, কিন্তু ওটাকে এই অন্ধকারে গুলি করাটাও বোকামি। পয়েন্ট-র‍্যাংকে না পেলে গুলি করব না। একবার গুলি মিস হলে ওটা আমাকে শেষ করে ফেলবে।

আমি ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগলাম, ওটাও আমার সাথে সাথে। ওটা একেবারে কাছে চলে এসেছে আমি আমার ব্লাস্টারটা তাক করলাম। মনে মনে দোয়া পড়ছি। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে একটা বিশাল ছায়া আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিল এবং আমার প্রাণ ফিরে পেল যেন। ওটা ছিল এমা-টু, হারিয়ে যাওয়া এম এ রোবট। রোবটটার কি হয়েছিল আর কোথা থেকে এল সেটা জানার সময় ছিল না আমার। আমি শুধু চেঁচিয়ে বললাম, 'এমা, বেবি, ঝোড়ো কুকুটাকে ধরে বেসে নিয়ে যাও।'

'ওটা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন আমার কথাটা শুনতেই পায়নি, 'মাস্টার, গুলি করবেন না, গুলি করবেন না।'

'রোবটটা ঝোড়ো কুকুরটাকে ধরার জন্যে দৌড় দিল।

'এমা, কুকুরটাকে ধরো,' আমি চিৎকার করে বললাম। কুকুরটাকে ও ধরল। তারপর দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমি গলা ফাটিয়ে ওকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু ফিরে এল না। ও আমাকে ঝড়ের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেল, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও।'

ডোনোভান নাটকীয়ভাবে তার গল্প শেষ করল, 'তুমি রোবটের প্রথম সূত্র সম্পর্কে জানো। সূত্রটা হলো : রোবট কখনো মানুষকে আহত করবে না বা নিষ্ক্রিয় থেকে মানুষের ক্ষতি করবে না। কিন্তু এমা-টু আমাকে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ঝড়ের মধ্যে ফেলে রেখে কুকুরটা নিয়ে চলে গিয়েছিল। তার মানে সে রোবটের প্রথম সূত্র ভঙ্গ করেছিল।

'ভাগ্যের জোরে, সেবার আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। আধা ঘন্টা পরে, ঝড় থেমে গিয়েছিল। এমন তরো ঝড় প্রায় দেখা দেয় ঝড়ের সময় শুরু হওয়ার আগে। আমি বেসে ফিরে আসার পরদিন সত্যি সত্যি ঝড় শুরু হলো। এমা-টু ফিরে এসেছিল আমি ফেরার দুই ঘন্টার পর এবং তারপরই প্রকাশ পেল এম এ মডেলের রোবটের কাণ্ড-কারখানা। তাই বাজার থেকে এম এ মডেলের রোবটগুলো তুলে নেওয়া হয়।'

'এমন কি হয়েছিল, 'ম্যাকফারলেন জানতে চাইল', 'এর কোনো ব্যাখ্যা আছে?'

ডোনোভান গম্ভীর হয়ে ওর দিকে তাকাল, 'এটা সত্য যে আমি মানুষ একজন বিপদে পড়ছিলাম, মৃত্যুও হতে পারত, ম্যাক, কিন্তু রোবটের প্রথম কাজ হলো আমার জন্যে ছুটে আসা এবং প্রথম সূত্র মেনে চলা। ভুলে যেও না ওগুলো ছিল এম এ সিরিজের রোবট এবং এই সিরিজের রোবটগুলোই হারিয়ে যাওয়ার আগে এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে নিজেদের অস্থিরতা প্রকাশ করে। ওটা কিছু একটার অপেক্ষায় থাকে, যা মনকে অস্থির করে তোলে। এবং তাই হয়েছিল।'

ডোনোভান ওপরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। তার গলার স্বর কাঁপছিল, 'ওই ঝোড়ো কুকুটরটা আসলে ঝোড়ো কুকুর ছিল না। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম এমা জুনিয়ার যখন এমা-টু ফিরে এল। এমা-টু তাকে আমার গুলির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। প্রথম সূত্র তখন কোথায় উড়ে গেছে মাতৃস্নেহের কাছে।

রোবোটিক নিবন্ধ

হরেক রকম রোবট

সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

একটু ভাবো তো, কেমন হবে যদি একদিন স্কুলে গিয়ে দেখতে পাও তোমার ক্লাস টিচার আর মানুষ নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা জলজ্যান্ত রোবট? ভাবছ বোকা বানাচ্ছি? একদম না। শুনলে অবাক হবে, কেবল শিক্ষকই না, অনেক আগে থেকে একটু একটু চেষ্টা করে আরো অনেক রকম রোবট তৈরি করেছে মানুষ। চলো আজ জেনে নেই এমন নানারকমের কাজে পটু কয়েকটি রোবটের নাম।

রোবট কুলি

কিছুদিন আগে পিয়াজিও নামের এক প্রতিষ্ঠান আবিষ্কার করে গিতা নামের একদম নতুন রকমের এই কুলি রোবটকে। গোলাকার ২৬ ইঞ্চি উচ্চতার এই রোবটটি একবারে ৪০ পাউন্ড ওজন বহন করতে পারে। সাথে আছে টাচস্ক্রিনের সুবিধাও। একবার চার্জ দিয়ে দিলে ৮ ঘন্টা চলতে পারে গিতা। তাও আবার ঘন্টায় ২২ মাইল বেগে। তবে সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে, গিতা তার মালিককে চিনে নেয় হাতের ছাপের মাধ্যমে। গিতার মালিক তার হাতের ছাপ দিলেই মালপত্র নিয়ে মালিকের পেছন পেছন গড়িয়ে যেতে থাকে রোবটটি। একা একাও অবশ্য চলতে পারে গিতা।

রোবট উকিল

কেবল শারীরিক পরিশ্রমই না, এখন থেকে মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি পরামর্শও দেবে রোবট মানুষকে। মানুষের হয়ে কোর্টে কেস লড়বে। আর সেটার শুরুটা হয়েছে গত বছর উকিল রোবট রসের মাধ্যমে। ২০১৪ সাল থেকে রসকে তৈরি করা শুরু করে রস ইন্টেলিজেন্স নামের প্রতিষ্ঠানটি। একটু একটু করে আইনের সবকিছু শিখে নিয়েছে রস। আর ১০ মাস পেরোতে না পেরোতেই সে বেকার হস্টলার নামে একটি মার্কিন ল' ফার্মে কাজও পেয়ে গিয়েছে।

রোবট মা

কিছুদিন আগে লাস ভেগাসে এমন এক রোবট মাকে নিয়েই হাজির হন প্রস্তুতকারক রফি হালাদিজান। অদ্ভুত এই রোবটের আসল রহস্য আর কিছুই না, এর ভেতরে থাকা একই সাথে অনেকগুলো জিনিসের উপরে নজর রাখার ক্ষমতা। মোশন কুকিজ নামে একটি কুকিজের মাধ্যমে একই সাথে ২৪টি জিনিসের উপরে নজর রাখতে পারে এই রোবট। শুধু যেটার উপরে নজর রাখতে হবে সেটার গায়ে এই কুকিজ লাগিয়ে দিতে হবে। ব্যাস! তাহলেই কাজ শেষ। এরপর তাপমাত্রা। গতিবিধিসহ অন্যান্য বিষয়ের উপরে নজর রেখে মায়ের মতন খেয়াল রাখতে শুরু করবে এই রোবটটিই। ওষুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে ঘুমপাড়ানো-সবকিছুই করবে এটি।

পর্যটক গাইড রোবট

উপরের রোবটগুলোর চাইতে একটু আলাদা এই রোবট পর্যটকদের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে সাহায্য করে। সম্প্রতি চীনের লিওনিং প্রদেশের ঝিনঝাউ ওয়ার্ল্ড গার্ডেন আর্ট এক্সপো এলাকায় ব্যবহার করা হচ্ছে দীর্ঘদেহী এই নারী রোবটকে। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে দর্শকের চাপ খুব বেশি থাকায় সেটা সামলাতেই এমন কাজ করা হয় বলে জানান স্থানটির মুখপাত্র ফেং কুং। তবে আর দশজন মানুষ পর্যটক গাইডের থেকে কোনো অংশেই কম যায় না এই রোবট। দরকার মতন পর্যটকদের সাথে ঘুরে বেড়ায় সে আর সব প্রশ্নের উত্তরও দেয়।

রোবট শিক্ষক

ক্লাস টিচারের বদলে যদি তোমার শিক্ষক হয়ে যায় কোনো এক রোবট, তাহলে কেমন হবে বলো তো? আর ঠিক এমন কিছু ভেবেই শিক্ষক রোবট নাও-কে তৈরি করেছে আবিষ্কারকেরা। মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করে এই শিক্ষক রোবট।

সার্জন রোবট

অপারেশনের কথা শুনলে নিশ্চয়ই ভয় লাগে তোমার? কিন্তু সেই অপারেশনটা যদি করে কোনো রোবট? ঠিক

এমনটাই করা হয় জার্মানির বোখুমের আউগুস্টা হাসপাতালে। ডাক্তার আর নার্সের পাশাপাশি এই হাসপাতালে অপারেশনের সময় হাজির থাকে একটি রোবটও। ডাক্তার কেবল নির্দেশ করেন আর রোবট সেই মতন সব কাজ করে দেয়। কেবল কী তাই? অপারেশন করা ছাড়াও রোগী আর ডাক্তারদেরকে ঠিক সময় মতন খাবার দেওয়া, মালপত্র সব জায়গা মতন পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে সাধারণ সব জ্বর মাপার মতন বিষয়গুলোতেও কাজ করে এই রোবটগুলোই। তবে অপারেশনের সময় কেবল রোবট দা ভিঞ্চির উপরেই ভরসা করতে পারেন চিকিৎসকেরা। বেশির ভাগ সময় ডাক্তারের চাইতেও নিখুঁত কাজ করে দা

ভিঞ্চি অপারেশনের টেবিলে। কেবল রোবটদের কারণেই আউগুস্টা হাসপাতালে কেবল রোগী নয়, ভিড় করে অনেক দর্শনার্থীও। সেটাও কেবল এক নজর রোবটদের কাজ করা সামনে থেকে দেখার জন্য।

মানুষের আদলে রোবট

তুমিই বলো! রোবট, সেটা যেমন করেই তৈরি করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সেটা তো একটা রোবটই। কিন্তু এবার আর অন্যবারের মতন যন্ত্রমানব রোবট তৈরি না করে আলাদা কিছু করতে চাইছেন বিজ্ঞানীরা। রোবটকে একেবারে মানুষের মতন করে বানিয়ে তুলতে চাইছেন তারা। মানুষের শরীরে যেমন নরম এবং শক্ত হাড় আছে, ঠিক সেভাবেই রোবটের শরীরেও হাড় রাখছেন তারা। সাথে থাকছে পেশী, মেরুদণ্ড আর হাড়ের সংযোগস্থলগুলোও।

ওয়েটার রোবট

নতুন কিছু বানাতে চীনাদের কোনো জুড়ি নেই। বিশেষ করে সেটা যদি হয় রোবটের মতন কোনো একটা কিছু তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আর তাই আরো একবার সবাইকে চমকে দিয়ে ওয়েটার রোবট তৈরি করেছে চীনা বিজ্ঞানীরা। কী করে না সেই রোবট? খাবার রান্না করা থেকে শুরু করে মেন্যু নিয়ে যাওয়া, খাবার পরিবেশন করা– সবকিছুই করে থাকে রেস্টুরেন্টে কাজ করা এই রোবটগুলো। মানুষের চাইতে অনেক দ্রুততার সাথে কাজগুলো করে ওরা বলে জানায় চীনের রেস্টুরেন্টগুলো। তবে কেবল খাবার পরিবেশন করাই নয়, নানারকম ভঙ্গি করে উপস্থিত মানুষদেরকে বিনোদন দেয় এই রোবটগুলো।

রোবট যখন আঁকিয়ে

ফরাসি আঁকিয়ে পাট্রিক জ্রেসের আঁকার ইচ্ছে ছিল খুব। ভালোবাসতেন তিনি ছবি আঁকতে। কিন্তু কিছু মানসিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় একটা সময় আঁকার ইচ্ছেটা চলে যায় জ্রেসের। কিন্তু তা হলে কী হবে? ইচ্ছে না করলেও আঁকতে যে হবে! আর তাই নিজের আঁকাআঁকির ভারটা পুরোপুরি রোবটদের উপরে ছেড়ে দেন জ্রেসে। একটু একটু করে তৈরি করেন পল নামের পাঁচটি আঁকিয়ে রোবটকে। লন্ডন ইউনিভার্সিটির গোল্ডস্মিথ কলেজে তৈরি করা এই রোবটদের প্রত্যেকটির নামই পল। তারা এখনো কাজ শিখছে। প্রতিদিন একের পর এক নতুন ব্যাপার শেখানো হচ্ছে তাদের ছবি আঁকার ব্যাপারে। আর খুব মনোযোগ দিয়ে সবকিছু ঝটপট শিখেও নিচ্ছে তারা। যদিও আর সব ক্লাসের মতন এই ছবি আঁকার ক্লাসেও মেধাবী এবং একটু কম মেধাবী– দুই ধরনের আঁকিয়েই আছে। কারো ছবি আঁকতে লাগে একটু বেশি সময়, কারো লাগে কম কিন্তু তাতে কী? আশা করা হচ্ছে কিছুদিনের ভেতরেই পুরোদস্তুর আঁকিয়েতে পরিণত হবে পল নামের রোবটগুলো।

রোবোটিক নিবন্ধ

সিনেমার 'রোবু'রা

নাবীল অনুসূর্য

রোবট নিজেই তো খুব মজার একটা বিষয়। বাংলায় বলা যেতে পারে যন্ত্রমানব। একটা যন্ত্র, যে কিনা মানুষের মতো কাজ করতে পারে। যত ভালো রোবট, তত ভালো মানুষের মতো কাজ করতে পারে। এই যেমন প্রফেসর শঙ্কুর রোবটটা। নাম রোবু। দেখতে অবশ্য খুব একটা সুন্দর নয়। দুটো চোখ দু রকমের। তাই মনে হয় ট্যারা। আর মুখে একটা হাসি ঝুলছে সবসময়। বিশেষ করে অঙ্কে যে ওর কী ভীষণ দখল! যত কঠিন অঙ্কই দেওয়া হোক না কেন, দশ সেকেন্ডের বেশি লাগবেই না। কিন্তু সমস্যা হলো, সত্যজিৎ রায় এই রোবুকে নিয়ে কোনো চলচ্চিত্র তৈরি করেননি।

তবে বাংলায় না হলেও, অন্যান্য ভাষায় কিন্তু রোবট নিয়ে মজার মজার চলচ্চিত্র ঠিকই নির্মিত হয়েছে। এক ইংরেজিতেই তো এমন কত চলচ্চিত্র আছে। অবশ্য রোবট নিয়ে যত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তার অনেকগুলোই আবার বড়োদের জন্য। তবে ছোটোদের জন্য মিষ্টি গল্পের রোবটের চলচ্চিত্রও একেবারে কম নেই।

ওয়াল-ই (২০০৮)

এখন থেকে প্রায় সাতশ বছর পরের কথা। তত দিনে

মানুষ ময়লা-আবর্জনা ফেলে পৃথিবীটা ভরিয়ে ফেলেছে। এমন অবস্থা যে, একটা গাছ বেঁচে থাকার মতো পরিষ্কার মাটি কোথাও নেই। আর গাছ না থাকলে তো অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষেও বাস করা সম্ভব নয়। শেষে আর কী করবে, মানুষ একটা বিশাল স্পেসশিপ বানিয়ে, সেখানেই বাস করতে শুরু করল। আর একটা রোবটকে দায়িত্ব দিল সেই ময়লাগুলো পরিষ্কার করার। সেই রোবটটারই নাম ওয়াল-ই। আরেকটা রোবটের নাম ইভা। ওর কাজ, পৃথিবীর কোথাও কোনো গাছ আছে কিনা, সেটা খুঁজে বের করা। তাহলে নতুন করে ওয়াল-ই'র পরিষ্কার করা জায়গায় গাছ লাগিয়ে, আবার নতুন করে পৃথিবী গড়ে তোলা হবে। ওদের মধ্যে ওয়াল-ই অনেক পুরনো দিনের রোবট। আর ইভা একদম নতুন মডেলের ঝকঝকে তকতকে এক রোবট। এই দুই রোবটের মধ্যে প্রেম হয়ে যায়। সে কী গভীর প্রেম! আর ওরা দুজন মিলেই স্পেসশিপের পুরো সিস্টেমের সাথে লড়াই করে পৃথিবীর বুকে নতুন করে মানুষের বসতির গোড়াপত্তন করে।

বিগ হিরো ৬ (২০১৪)

হিরো হামাদার বয়স কম হলে কী হবে, ও যাকে বলে একজন রোবট-বিশেষজ্ঞ। আগে যেমন গ্রামে গ্রামে মোরগ লড়াই হতো, ওদের তেমন হয় রোবট লড়াই। সেই লড়াইয়ে ওর রোবটের সাথে কেউ পারে না। ওর বড়ো ভাই তাদেশি রোবটের ব্যাপারে ওর চেয়েও এক কাঠি বেশি। কিন্তু তাদেশি ওর মতো মারদাঙ্গা রোবট বানায় না। তাদেশির রোবটের নাম বেম্যাক্স। ও একটা হেলথ কেয়ার রোবট। ওকে যার সাথে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হবে, তার স্বাস্থ্যের সব খুঁটিনাটির দেখাশুনা করবে ও। পরে হিরো মাইক্রোবট বানায়। একদম ছোটো ছোটো রোবট, কিন্তু ওরা আবার একসাথে হয়েও কাজ করতে পারে। আর এই নিয়েই শুরু হয় গণ্ডগোল। হিরো একটা সাইন্স ফেয়ারে তার মাইক্রোবট দেখাচ্ছিল। সেখানে আগুন লেগে তার বড়ো ভাই মারা যায়। পরে হিরো আবিষ্কার করে, তার এই মাইক্রোবট কাজে লাগাচ্ছে এক দুষ্টু লোক। সেই লোককে শায়েস্তা করতেই, হিরো একটা দল গঠন করে। ওর ভাইয়ের বানানো বেম্যাক্স আর ভাইয়ের বন্ধুদের নিয়ে। দলের নাম রাখা হয় বিগ হিরো ৬। তারপর অসম্ভবকে সম্ভব করে ওরা ঠিকই

সেই লোককে শায়েস্তা করে।

রিয়েল স্টিল (২০১১)

রিয়েল স্টিলের গল্পটা ২০২০ সালের। তত দিনে মানুষ বক্সিং খেলাই বাদ দিয়ে দিয়েছে। তার বদলে গড়ে উঠেছে নতুন আরেকটা খেলা- রোবট বক্সিং। খেলাটা দ্রুত জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে। দুটো রোবট বক্সিং করে, আর বাইরে থেকে দুই জন রোবট দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করে। চার্লি কেন্টন আগে বক্সার ছিল। এখন সে রোবট বক্সিং খেলে। ওর রোবটের নাম অ্যাম্বুশ। এক লড়াইয়ে অ্যাম্বুশ এমন মার খেল, একদম অকেজোই হয়ে পরল। ওর একটা ছেলে আছে, ম্যাক্স। ম্যাক্স থাকে ওর আন্টির কাছে। সেই গ্রীষ্মে ম্যাক্সকে দেখাশোনার ভার পরল চার্লির ওপর। বাপ-বেটা মিলে চার্লির নতুন জাপানি রোবট নয়েজি বয়কে খুব করে প্রশিক্ষণ দিল। কিন্তু লাভ হলো না। নয়েজি বয়ও রোবট বক্সিংয়ে মার খেয়ে বাতিল হয়ে গেল। তখন আর চার্লির কাছে রোবট কেনার টাকাও নেই। তখন ওরা বাতিল রোবটের স্তূপ থেকে খুঁজে-পেতে অনেক পুরনো একটা রোবট নিয়ে আসলো, নাম অ্যাটম। আর সেই অ্যাটমকে নিয়েই নতুন নতুন মডেলের সব রোবটকে হারাতে লাগল। আর এই অ্যাটমকে প্রশিক্ষিত করে তোলা থেকে শুরু করে তাকে নিয়ে সবার সাথে জিততে জিততে বাবা-ছেলের মধ্যে গড়ে উঠল সত্যিকারের বাপ-বেটার সম্পর্ক।

রোবটস (২০০৫)

রোবটদের যদি নিজস্ব একটা জগৎ থাকত, যেখানে কেবল রোবটরাই বাস করে, কী ভীষণ মজারই না হতো সেটা। সেখানকার সবাই রোবট। বাবা রোবট, মা রোবট। রোবট ছেলে, রোবট মেয়ে। রোবট বন্ধু, রোবট শত্রু। রোবটদের গ্রাম, রোবটদের শহর। এমনই এক জগতের গল্প 'রোবটস'। সেই জগতের এক রোবটের নাম রডনি কপারবটম। ও অবশ্য কোনো নতুন মডেলের রোবট নয়। কিন্তু ওর উদ্ভাবনী ক্ষমতা খুব ভালো। সেটাকে সম্বল করেই ও পাড়ি জমায় রোবট সিটিতে। উদ্দেশ্য বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিগওয়েল্ডের সাথে দেখা করা। ওর বিশ্বাস, ওর কাজকর্ম দেখলে বিগওয়েল্ড ওকে তার করপোরেশনে নিয়ে নিবে। কিন্তু রোবট সিটিতে যাওয়ার পর, শহরের কোথাও আর তাকে খুঁজে পায় না রডনি। তখনই সন্দেহ হতে থাকে, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে বিগওয়েল্ডের। তারপর শহরের নতুন জোটা বন্ধুদের নিয়ে সেটাই ও খুঁজে বের করে।

দ্য আয়রন জায়ান্ট (১৯৯৯)

রোবট নিয়ে প্রায় সব সিনেমার গল্পই ভবিষ্যৎ কালের। কিন্তু এই সিনেমাটা উলটো, এটার গল্পটা ১৯৫৭ সালের। হগার্থ হিউজ নামের এক ছেলে হঠাৎ একদিন

আবিষ্কার করে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান ছেলে। কারণ, ওর একটা রোবট আছে। রোবটটা কাজকর্মে একদম বাচ্চা ছেলের মতো। হগার্থকে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পরতে দেখলে পিছে পিছে ও-ও ঝাঁপিয়ে পরে। কিন্তু রোবটটা আকারে ইয়া বড়ো। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পরলে পুরো পুকুরের পানি চারপাশে ছড়িয়ে যায়। তবে রোবটটা হগার্থকে খুব মানে। হগার্থ ওর নাম দেয় দি আয়রন জায়ান্ট। ওদিকে রোবটটার কথা জেনে যায় সরকারি এক ক্ষ্যাপা গোয়েন্দা। সে এসে প্রথমে হগার্থের পিছে লাগে। সুবিধা করতে না পেরে সরাসরি ট্যাংক-কামান-যুদ্ধবিমান নিয়ে চলে আসে আয়রন জায়ান্টকে মারার জন্য। প্রথম দিকে হগার্থ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা রাখে আয়রন জায়ান্টকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আর পারে না, ঘুরে দাঁড়ায় আয়রন জায়ান্ট।

রোবোটিক নিবন্ধ

রোবোটিক্সের অনন্য জগৎ

নাদিম মজিদ

করার কথা ছিল মানুষের, করছে একটি যন্ত্র-এমন দৃশ্য বাড়ছে আমাদের পৃথিবীতে। সুপারশপের অ্যাটেনডেন্ট, বাড়ির ক্লিনার এমনকি মঙ্গলে পরিবেশের তথ্য নিয়ে আসতে ব্যবহৃত হচ্ছে রোবট। রোবোটিক্সের অনন্য দুনিয়ায় তোমাদের প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার এমনই কিছু তথ্য জানাচ্ছি তোমাদের-

হঠাৎ মা অসুস্থ। বাড়ির অবস্থা বিচ্ছিরি। পাকাবাড়ির টাইলসে ময়লার দাগ পড়ছে। বাড়ির এমন অবস্থা দেখে মন খারাপ রাজুর। সন্ধ্যায় বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় নিয়ে আসেন একটি ক্লিনার রোবট। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পরিষ্কার করে ফেলে বাড়ির মেঝে। আমাদের দেশে এখনো সে ধরনের রোবট না আসলেও ইউরোপ আমেরিকায় পাওয়া যাচ্ছে সে ধরনের রোবট। এ ধরনের রোবটগুলো মানুষের কাজকে সহজ করে দিচ্ছে। অনেক কাজ মানুষ এখন নিজে না করে রোবটের সাহায্য নিয়ে করছে।

বিশ্বে নিত্যনতুন প্রযুক্তি আসছে। প্রযুক্তি সহজলভ্য হচ্ছে। যে ধরনের প্রযুক্তি ১০০ বছর আগে চিন্তা করা যেত না, এখন সে প্রযুক্তি হাতে নিয়ে মানুষ খেলছে। প্রযুক্তি সম্পর্কে আপডেট থাকার জন্য ছোটোদেরও উচিত রোবোটিক্সে আসা। তারা আসতে পারে স্কুলে পড়ার সময়।

রোবোটিক্সে আসতে চাইলে প্রথমে জানতে হবে প্রোগ্রামিংয়ের যে-কোনো একটি ভাষা। কারণ, রোবটকে দিয়ে কাজ করাতে হলে তাকে তার ভাষায় আদেশ করতে হবে। রোবটে তৈরির উপযোগী যে-কোনো যন্ত্রকে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা দিয়ে সাজিয়ে তার ভেতর কাঠামো তৈরি করে, আদেশ করলে সে মানুষের কথা শুনবে। বর্তমানে বেশ কিছু প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা জনপ্রিয়। যেমন সি, সি++, জাভা, পাইথন প্রভৃতি। প্রোগ্রামিং শুরু করার জন্য যে কারো জন্য আদর্শ হবে সি।

যে-কোনো প্রোগ্রাম নিয়ে প্রথমে কাজ করতে হয় কম্পিউটারে। তাই কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা থাকতে হবে। কয়েকভাবে প্রোগ্রামিং শেখা যায়। যেমন স্কুল ও কলেজে তথ্যপ্রযুক্তি পাঠ্যবই পড়ে ধারণা নেওয়া, ইউটিউব থেকে ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখা, কোনো বড়ো ভাই প্রোগ্রামিং জানলে তার সাহায্য নেওয়া।

রোবোটিক্স চর্চা করতে হলে রোবটের পাশাপাশি বিভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যন্ত্রগুলো পাওয়া যাবে ঢাকার পাটুয়াটুলিতে। এছাড়া অনলাইন শপ টেকশপবিডি, প্রজেক্টশপবিডি থেকেও কেনা যাবে।

বাংলাদেশে রোবট চর্চার জন্য বিভিন্ন আসর বসে। স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান মেলা, প্রজেক্ট শোকেসিং, প্রোগ্রামিং কনটেস্টে রোবোটিক্স জানা শিক্ষার্থীদের সুযোগ রয়েছে।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বুয়েট, চুয়েট, রুয়েট, এমআইএসটি, আইইউটি, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটিতে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় রোবোটিক্স প্রতিযোগিতা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রোবোটিক্স পর্যায়ে অংশ নিয়ে নিয়মিত সাফল্য পেয়ে আসছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি রোভার চ্যালেঞ্জ, যুক্তরাজ্যের ইউকে-ইউনিভার্সিটি রোভার চ্যালেঞ্জ, পোল্যান্ডের ইউরোপিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জ, ভারতের টেকক্রিতি প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

এক সময় রোবোটিক্স নিয়ে পড়াশোনা কিংবা যন্ত্র নিয়ে কাজ করা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনার বিষয়। সময় এখন অনেক বদলে গেছে। স্কুল-কলেজে পড়ার সময়-ই শিক্ষার্থীরা রোবোটিক্সে হাতেখড়ি নেয়। বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়ে পুরস্কার ছিনিয়ে আনে।

‘রোবোটিক্স’ পড়তে চাও?

শান্ত শাহরিআর

যন্ত্রের উন্নতিকে মানুষ বরাবরই আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। মানুষের মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে এমন যন্ত্র বানানোর ইচ্ছেটা অনেক আগের। সেই চারশ বছর আগে লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চি একটা যন্ত্রমানব বানাতে চেয়েছিলেন যেটা আসল যোদ্ধাদের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারবে। তাঁর নকশা সেই আমলে বাস্তবায়িত না হলেও পরবর্তী বেশ কয়েকটা শতাব্দির পর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ১৯২১ সালে নাট্যকার কারেল চাপেকের ‘রসুম’স ইউনিভার্সাল রোবটস’ নাটকের মাধ্যমে মানবজাতি সর্বপ্রথম রোবট শব্দটা শুনতে পায়। এরপর থেকে রোবটের পথচলা জোরেশোরেই চলছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার এত বেড়েছে যে এখন রোবট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আলাদা একটা সাবজেক্ট খুলতে হয়েছে। নতুন প্রজন্মের মাঝে রোবট নিয়ে আগ্রহের সীমা নেই। রোবট বানাতে কি ধরনের দক্ষতা দরকার? কোন বিষয়ে পড়লে ভালো হবে?- এ ধরনের প্রশ্ন প্রকৌশলী হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা কেন করেন তা সহজেই বুঝা যায়। রোবটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং সেটা শুধুমাত্র রোবট নির্মাণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। রোবোটিক্সে ক্যারিয়ার গড়তে হলে নিজেকে সব ধরনের প্রকৌশল জ্ঞানে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। রোবট প্রকৌশলী হতে হলে যন্ত্রকৌশল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স এই তিনটি বিষয়ে দখল থাকতে হবে। আরো দরকার সাইকোলজি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা। ডাক্তার হতে চাইলে মেডিসিন নিয়ে পড়তে হয়, কোনো দালান বানাতে চাইলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু রোবট বানাতে চাইলে ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, বায়োটেকনোলজি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ভালোভাবে জানতে হবে।

প্রথম দিকের প্রস্তুতি: বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে রোবোটিক্স নিয়ে পড়তে চাইলে দুইটি বিষয়ে এখনই নিজেকে পাকা করে তোলার চেষ্টা করতে থাকুন। এর প্রথমটি হলো গণিত বা ম্যাথমেটিক্স, আর অন্যটি পদার্থবিদ্যা বা ফিজিক্স। অংক কষার সময় এ্যালজেবরা অধ্যায়টা গুরুত্ব দিয়ে শিখতে হবে। আরো শিখতে হবে জ্যামিতি। পদার্থবিদ্যা ছাড়া রোবোটিক্স অচল। কারণ এনার্জি, ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, ম্যাকানিক্স, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ইত্যাদি বিষয়গুলোই রোবটবিদ্যার মূল অংশ। বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে কীভাবে গণিত প্রয়োগ করতে হয় তা জানতে হবে।

জানার মতো বিষয়গুলো: রোবটের বডি বা শরীর নিয়ে আলোচনা করে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। আর নার্ভ সিস্টেম বা স্নায়ু সংক্রান্ত বিষয় গড়ে উঠেছে ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেকটনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর ভর করে। ব্রেন বা মস্তিষ্ক বানাতে প্রয়োজন হয় কম্পিউটার সায়েন্স। বিজ্ঞান বিষয়টাকে পানির মতো সহজ করে ফেলতে পারলেই রোবোটিক্স নিয়ে পড়া যাবে। নির্দিষ্টভাবে কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলোতে দক্ষতা প্রয়োজন। প্রথমত

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। এই বিষয়টি ছাড়া রোবোটিক্স অচল। কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি বিষয়গুলো যত্নসহকারে পড়তে হবে। এর সাথে দরকার নকশা এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সম্যক ধারণা। প্রকৌশল বিদ্যা বাস্তবে প্রয়োগ করতে প্রোডাক্ট ডিজাইন, গ্রাফিকস্ কমিউনিকেশন, ম্যানুফ্যাকচারিং ইত্যাদি বিষয়গুলো দরকার। নির্দিষ্টভাবে কিছু সাবজেক্ট অবশ্যই পড়তে হবে যেমন অটোমোটিভ, বায়োইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স, মেকাট্রনিক্স এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এই বিষয়গুলোর সমন্বয়েই রোবটবিদ্যা গড়ে উঠেছে।

রোবোটিক্সে ডিগ্রিঃ রোবোটিক্স বিষয়টা কিছুকাল আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ে খুঁজে পাওয়া যেত না। এখন দেশের কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে ডিপার্টমেন্ট অব রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। এখানে রোবট নিয়ে ভালো পড়াশোনা হয়। বেশকিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকাট্রনিক্স সাবজেক্টে ডিগ্রি দেওয়া হয় যেটা রোবটিক্সের মতোই। ঢাকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা কিছু প্রতিষ্ঠান রোবট বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। রাজধানীর প্রগতি সরণিতে এমনই একটি প্রতিষ্ঠান আইরোবট ল্যাব। রেবাট বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। রোবটিক্স নিয়ে বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে চান এমন শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় প্রথমে থাকা উচিত জার্মানির নাম। কারণ বর্তমান বিশ্বে রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তীর্থস্থান ধরা হয় জার্মানিকে। এর পরেই আছে যুক্তরাষ্ট্রের নাম। রোবট বিষয়ে ভালো পড়াশোনা হয় আমেরিকার এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা তালিকা প্রকাশ করেছিল মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। সেখানে এক নম্বরে আছে পেনসিলভানিয়া প্রদেশের কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটি।

কোন বিভাগে ক্যারিয়ার গড়বেন! রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রমানব বানাবার মতো শুধুমাত্র একটা বিষয় নয়। এর আছে অনেক ডালপালা। রোবট বিদ্যায় ডিগ্রি নেওয়ার পরে হতে পারেন রোবটিক্স টেস্টিং টেকনিশিয়ান অথবা রোবটিক্স প্রোগ্রামার। রোবটিক্স সিস্টেম কন্ট্রোলার কিংবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটিক্স ইঞ্জিনিয়ারেরও চাকরির বাজার ভালো।

রোবট

উম্মে সুমাইয়া

মানুষের মতো দেখতে
কিন্তু মানুষ তা নয়
সবার কাছে প্রিয়
রোবট তাকে কয়।

দেহখানি গড়া তার যন্ত্র দিয়ে
করতে পারে অনেক কাজ
বাসা কিংবা অফিস, আদালতে
সব জায়গাতে বাড়ছে রোবটেরই রাজ।

দশম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

রোবটের টুকিটাকি

শাহানা আফরোজ

বাংলাদেশ রোবোটিক্স ক্লাব

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আছে রোবোটিক্স ক্লাব। বেসরকারি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীর উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই ক্লাব। ২০১২ সালে এর কাজ শুরু হয়। যদিও যারা এই ক্লাব শুরু করেছে তারা সবাই বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণা কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। অনেকে আছেন দেশের বাইরে। বাংলাদেশের প্রথম নিজস্ব ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহের উদ্ভাবকের দল এই ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের ক্যাম্পাস মাতানোর পাশাপাশি বিদেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। হাজার খানেক রোবট আর রোবট তৈরির মস্তিষ্ক রোবোটিক্স ক্লাবের সদস্য। অস্থায়ী সদস্যও অনেক। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে রোবোটিক্স নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন কিছু উদ্ভাবনে মত্ত এই ক্লাবের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যরা।

উচ্চতম ভবনে রোবট

দুনিয়ার উচ্চতম ভবন বুর্জ খলিফা পাহাড়া দিচ্ছে রোবট পুলিশ। বুকে রয়েছে কম্পিউটার টাচস্ক্রিন। কোনো অপরাধ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তা রেকর্ড হবে রোবট পুলিশ কম্পিউটারে। রয়েছে ক্যামেরা। ফলে পুলিশ কন্ট্রোল রুম পৌঁছে যাবে ঘটনাস্থলের লাইভ ছবি। আধুনিক প্রযুক্তির ওপর ভর করে নিরাপত্তায় এমনই নতুনত্ব নিয়ে এল দুবাই কর্তৃপক্ষ।

রোবোটিক্স ফার্ম

এ ফার্মের পথচলা শুরু হয় ২০১৩ সালে। বর্তমানে এর স্বত্বাধিকারী জাপানিজ ইন্টারনেট, সোলার এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সফট ব্যাংক গ্রুপ কর্পোরেশন। ২০১৪ সালে সফলভাবে পিপার নামের মানুষের মতো রোবট বানায় এই ফার্ম। মানুষের ক্ষমতার বাইরের সমস্যাগুলো সমাধান করবে এই রোবট।

নাসার 'মার্স রোভার' উন্মোচন

মঙ্গলগ্রহে ভ্রমণের জন্য নতুন একটি বাহনের কনসেপ্ট উন্মোচন করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসা।

জনপ্রিয় হলিউড সিনেমা ব্যাটম্যান সিরিজের 'ব্যাটমোবিল' -এর চেয়েও বেশি 'স্টাইলিশ' বলা হয়েছে নতুন 'মার্স রোভার'-কে। যানটির সামনে ও পেছনের অংশ দুই ভাগে বিভক্ত। সামনের অংশ নকশা করা হয়েছে অনুসন্ধানের জন্য, যেখানে রেডিও এবং ডিপিএস ন্যাভিগেশন রাখা হয়েছে। আর পেছনের অংশে রাখা হয়েছে ল্যাবরেটরি।

মঙ্গলগ্রহে আমাদের রোবট

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী (১৯ জন) অগ্রদূত নামের একটি রোবট তৈরি করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে এই রোবট মঙ্গলগ্রহে গিয়ে সেখানকার তাপমাত্রা পরিমাপ, পানির উপস্থিতি কিংবা সেখানে বিষাক্ত গ্যাস আছে কি-না তা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে। আমেরিকার জননিভারমিট অব রোভার চ্যালেঞ্জার্স (ইউআরসি)-এর প্রতিযোগিতায় নিবন্ধিত হয়েছে অগ্রদূত রোবট।

কবিতা

যেও তাদের কাছে

হাসনাত আমজাদ

একটা ছেলে, পড়ছে হেলে
দেখছি বারে বারে
দাঁড়িয়ে দূরে পোস্টঅফিসের ধারে।

গেলাম কাছে, মানুষ আছে
দেখছে না কেউ তাকে
লোকজন আর গাড়িঘোড়ার ফাঁকে।

পাশে দাঁড়াই, হাতটা বাড়াই
ধরলো চেপে জোরে
হচ্ছে মনে আছে সে এক ঘোরে।

হলাম অবাক, নয় সে সবাক
কথায় প্রতিবন্ধী
আগ্রহে তার দিকে এবার মন দিই।

বই খাতা আর, ব্যাগ আছে তার
আছে আঁকা ছবি
জীর্ণ এবং ছেঁড়াফাটা সবই।

শুধুই কাশে, তবু হাসে
গায়ে ভীষণ জ্বর
শরীরটা তার কাঁপছে থরথর।

ইশকুলে যায়, দেখতে কে পায়?
চুপটি বসে থাকে
তার কথা সে বলবে বলো কাকে?

কষ্ট পেলে? এমন ছেলে
খুঁজলে পাবে, আছে
যেও তাদের একটুখানি কাছে।

ভুঁড়ি বিড়ম্বনা

অতনু তিয়াস

ভুঁড়ি ভুঁড়ি ভুঁড়ি
ভুঁড়ির জ্বালায় ইচ্ছে করে
বুকে বসাই ছুড়ি
চলতে পথে শরম লাগে
শীতের দিনেও গরম লাগে
ভুঁড়ি দেখে কেউ বা হাসে
কেউ বা মারে তুড়ি।

ভুঁড়ি ভুঁড়ি ভুঁড়ি
ভুঁড়ির কথা লিখতে কলম
শেষ হবে চার কুড়ি
বসতে বলো উঠতে বলো
দূরে কোথাও ছুটতে বলো
ভুঁড়ির ভারে ব্যাকুল হয়ে
কান্নাকাটি জুড়ি।

ভুঁড়ি ভুঁড়ি ভুঁড়ি
ভুঁড়ি নিয়ে কেউ করো না
ভুলেও বাহাদুরি
নাইতে বিপদ খাইতে বিপদ
নাচতে এবং গাইতে বিপদ
হতচ্ছাড়া ভুঁড়িই হলো
সব ঝামেলার গুঁড়ি।

মা

মো. শহিদুল ইসলাম

মা হলো যে সৃষ্টি জগতের সেরা উপহার
এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তুলনা নাই যার।
মা- আমাদের ধরনিতে আসার গৌরব ও অহংকার।

মা যে আমার জীবনের পথে
তিলে তিলে গড়ে দেবার একক কারিগর
বড়ো হওয়ার স্বপ্নে মা- রেখেছে তাঁর অঙ্গীকার।

মা-যে আমার মসজিদ মন্দির সকল প্রার্থনা
মা-যে আমার জীবনের সকল সফলতার সান্ত্বনা।
মা-যে আমার সকল কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা
মা-যে আমার জীবন যুদ্ধে সাহসী অনুপ্রেরণা।

গাছ আমাদের বন্ধু সবার

নাসিরুদ্দীন তুসী

সবুজ পাতার হাতছানিতে গাছ আমাদের ডাকে,
গাছ আমাদের বন্ধু সবার, সবাই জানি তাকে।

গাছেরও প্রাণ আছে এবং নয় মোটে সে বোবা,
সবুজ-শ্যামল হাসি যে তার এই পৃথিবীর শোভা।
পাতা ও ফল, ফুলের ভাষায় গাছ বলে যায় কথা
ঋষির মতো ধারণ করে ধৈর্য-নীরবতা!

গাছের চেয়ে উপকারী কেইবা হতে পারে,
কয়লা ও কাঠ, কাগজ পেলাম গাছের উপহারে।
বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়ে, সুনামি, আইলাতে
গাছ আমাদের দেয় পাহারা দিনে এবং রাতে।

পাহাড় থেকে বন্যা নামে, বৃষ্টি আকাশ থেকে,
গাছই মাটি ধরে রাখে শিকড় দিয়ে ঢেকে।
গাছগুলো না থাকলে তবে মাটিও যেত সরে
এই মাটিতে চাষ-বসবাস হতো কেমন করে?

বন যদি না থাকে কোথায় থাকবে পশুপাখি,
গাছের ছায়া, বনের মায়া যতন করে রাখি।
গাছের আছে ওষুধি গুণ রোগ নিরাময় করে,
অসুস্থতায় গাছের সেবা পাচ্ছি ঘরে ঘরে।

সুগন্ধি ফুল বাহারি ফল শীতল-সতেজ হাওয়া,
ভালোবাসার অশেষ ডালি গাছের কাছে পাওয়া।
গাছের কাছে আমরা সবাই চিরকালই ঋণী,
এসো তবে, আশপাশের গাছগুলোকে চিনি।

বাবার মতো গাছ আমাদের দিচ্ছে শ্যামল ছায়া,
মায়ের মতো আদরছোঁয়া, মমতা আর মায়া।
মহাকালের সাক্ষী হয়ে ইতিহাসের গাথা,
লিখে রাখেন বৃক্ষদাদু খুলে আপন পাতা।

জীবন শুধু যন্ত্র হবে- গাছের সবুজ ছাড়া,
মন দিয়ে তাই বন বাড়াতে বিবেকে দাও নাড়া।
গাছ আমাদের বন্ধু সবার, গাছ আমাদের প্রিয়,
ভালোবেসে কাছের বন্ধু গাছের যত্ন নিও।

নতুন সূর্যোদয়

মাসুমা রুমা

কদম গাছে তোতা পাখি
আতা গাছে পরি
উলটো ভাবে ঘুরছে দেখো
উলটো দেশের ঘড়ি।

ভাবছ বুঝি হঠাৎ কেনো
উলটো কথা কই
ঘর ভর্তি খেলনা পুতুল
কোথায় ছড়ার বই?

পড়তে হবে অনেক ছড়া
পড়তে হবে গল্প
পড়াশোনা ভুলে গেলে
শিখবে নেহাৎ অল্প।

বন্ধ করো উলটো চলা
ছিনিয়ে আনো জয়
তোমরা শিশু নতুন দিনের
নতুন সূর্যোদয়।

খুকুর ছন্দ

নূর হোসেন

আয়রে আয় টিয়ে
খুকুর ব্যাগ নিয়ে,
স্কুলেতে যাবে খুকু
নতুন বই নিয়ে।
ব্যাগের ওজন বেশি
তবুও খুকু খুশি,
নতুন বইয়ের আনন্দে
খুকু চলে ছন্দে।

নিবন্ধ

গল্পের মতো বর্ষা

ফারুক হাসান

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। পালাক্রমে এই ঋতু-বৈচিত্র্যে অবগাহন করে আমরা বেড়ে উঠি। বর্ষা আমার প্রিয় ঋতু। বন্ধুরা, তোমরা তো জানো- আষাঢ়-শ্রাবণ দুমাস বর্ষাকাল। এই বর্ষাকালের দুই মাস জুড়েই কম-বেশি বৃষ্টি হয়। কখনো রিমঝিম শব্দে গুঁড়ি গুঁড়ি আবার কখনো আকাশ ছাপিয়ে ঝমঝম করে। এই রোদ, এই বৃষ্টির অপরূপ খেলায় শহর-বন্দর, গ্রাম-বাংলার অবারিত মাঠ-প্রান্তর এক অনাবিল সৌন্দর্যে সেজে ওঠে। তখন মুখে মুখে ছড়া কাটতে খুব ভালো লাগে–

'ওই আকাশে পরীর নাচন
বাতাস বাজায় নুপুর
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
সকাল-বিকাল-দুপুর।

বর্ষাকালের এই বৃষ্টিকে নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক কবিতা, অনেক গান লিখেছেন। হৃদয়গ্রাহী তার সেসব গান-কবিতা আমাদের বর্ষাকে ভালোবাসতে শেখায়। তিনি যখন বলে ওঠেন-

'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।'

তখন বর্ষার আরেকটি রুদ্রমূর্তি আমাদের সামনে আবছায়া হয়ে ভেসে ওঠে। অজানা আশঙ্কায় আমরা শঙ্কিত হই। প্রকৃতির এই বিরূপ অবস্থায় বাবা-মায়েরা আমাদের ঘর থেকে বের হতে দেন না। অনেকটা বুকে আগলে রাখেন। ছোটোরা সে সময়টা মায়ের দেওয়া ভাজা বুট খেতে খেতে সাপ-লুডু খেলে কিংবা কখনো কাগজের নৌকা বানিয়ে সামনের উঠোনে হাঁটু সমান পানিতে ছেড়ে দেয়। এ দিনে মা খিচুড়ি রান্না করেন। খিচুড়ির সুগন্ধে সারা বাড়ি মৌ মৌ করে। আর মায়ের হাতের এই খিচুড়ি খাওয়ার লোভে গ্রামের বাড়ি থেকে তল্লিতল্পা গুটিয়ে হারু আংকেল আমাদের শহরের বাড়িতে এসে হানা দেন।

বর্ষাকালের মোহনীয় রূপটি গ্রামেই বেশি ধরা পড়ে। তাই হারু কাকু যাওয়ার সময় আমি তার পিছু ছাড়ি না! অগত্যা আমার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে মা ওখানে যে কদিন থাকি পড়ার জন্য ব্যাগে বইপত্র গুছিয়ে দেন। গ্রামের বাড়িতে গেলে আমার খুশি আর ধরে না। হারু কাকুর ছেলে মন্টিকে নিয়ে এই ভরা বর্ষায়ও

সারাটা গ্রাম দাপিয়ে বেড়াই। আমাদের টিনে ছাওয়া বিশাল চওড়া ঘর। সামনে নিকানো উঠোন। উঠোন পেরিয়ে শানবাঁধানো ঘাট সমেত পুকুর। বৃষ্টি এলেই মন্টিকে নিয়ে আমি ঘাটলায় চলে যাই। ওখানে বসে পুকুরে বৃষ্টির টিপটিপ শব্দ শুনি। আর ছড়া কাটি-

'বৃষ্টি এলো কাশবনে
জ্বালল সাড়া ঘাসবনে।
বকের সারি কোথায় রে
লুকিয়ে গেলে বাঁশবনে।'

এক সময় পুকুর পাড়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঝিরিঝিরি বাতাসে শরীরে কাঁপুনি ধরায়। পুকুরে ঢিল পড়তেই সচকিত হয়ে দেখি বেত হাতে টুনি বু। দাঁড়া বাঁদর–বলতেই আমরা কাকভেজা অবস্থায় এক দৌড়ে ঘরের চৌকাঠে এসে হাজির। চাচিমা হাসি মুখে গামছা আর লুঙ্গিটা দিয়ে বলেন–তাড়াতাড়ি কাপড় পালটিয়ে খেতে এসো। আজ চাচিমা সর্ষে বাটা দিয়ে ইলিশ রেঁধেছেন। সঙ্গে ইলিশ মাছের ডিমও। রান্নার মন মাতানো সুগন্ধে পেটটা এমনিতেই ভরে যায়।

রাতে টিনের চালে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। মন্টি বলল, এখন বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যাবে। ইস, যদি রাতে খাওয়া যেত!

রাতে গেলে কী হয়?

দূর বোকা! রাতে মাছ ধরার মজাই আলাদা।

শুনেছি রাতের বেলায় মাছ ধরতে গেলে নাকি মেছো ভূতে পায়?

কে বলেছে তোকে? তোরা শহরের ছেলেরা এই কথা বিশ্বাস করিস?

মন্টির কথায় আমি চুপসে যাই। সিদ্ধান্ত নিলাম কাল বৃষ্টি হলেই বিলে মাছ ধরতে যাবো।

পরদিন দেখলাম আকাশ ছাপিয়ে ভারি বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির গর্জনে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম। হেঁসেল ঘরে গিয়ে চা-নাশতা সেরে আমি আর মন্টি জবুথবু হয়ে বসে আছি। ফাঁক খুঁজছি-কখন বৃষ্টি ধরে আসবে। কখন বাইরে যাবো। আমাদের গোবেচারা ভাব দেখে টুনি বু ফিক করে হেসে ফেললেন। হারু কাকার বড়ো মেয়ে টুনি বু কলেজে পড়েন। খুব মেধাবী ছাত্রী। সেজন্য বাড়ির মধ্যে তার আলাদা কদর। অন্যদের ফাঁকি দিতে পারলেও তাকে ফাঁকি দেওয়া বেশ কষ্টকর। অপেক্ষায় থাকি কখন টুনি বু গোসল করতে গোসলখানায় ঢোকেন। আর সেই সুযোগে আমি আর মন্টি পগারপার।

গ্রামের আলপথ দিয়ে হেঁটে চলছি আমরা। যদিও বৃষ্টির পানির তোড়ে খাল-বিল, পথঘাট সব একাকার হয়ে গেছে। মন্টির হাতে ঝুঁড়ি। আমাকে পেছনে ফেলে খালপাড়ের দিকে নেমে যায় সে। ইতিমধ্যে বর্ষার দুকূল ছাপানো পানিতে ডুবে গেছে বিস্তীর্ণ মাঠ, ধানক্ষেত। দূর থেকে দেখলে নদী ভেবে ভুল হতে পারে। সেই দিকে তাকিয়ে আমি তন্ময় হয়ে যাই। এভাবে প্রিয় বর্ষা আমার কৈশোরে প্রিয় ঋতুতে পরিণত হয়েছিল। যদিও বর্ষা অনেক সময় মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তথাপি তার উপকারিতাও কিন্তু কম নয়।

বিষ্টি

আবেদীন জনী

বিষ্টি নামে শ্যামল গ্রামে
সকাল দুপুর জলের নূপুর বাজে-
গাছের পাতায়, মাথার ছাতায়
সুর মেখে যায় মনের খাতায়
টপটপাটপ টাপুর টুপুর
কী জাদু হায় ছন্দ-কারুকাজে!
নদীর বুকে জল করে থই থই
ডোবার জলে টেংরা-পুঁটি-কই।
পদ্ম ফোটে, শাপলা ফোটে
কদম-কেয়ার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে-
বৃক্ষলতা বিষ্টি ধোয়া
মাটির বুকে জলের ছোঁয়া
সজীবতার নিটোল ছবি
বিষ্টিভেজা মাঠের ঘাসে ঘাসে।
বিষ্টিতে ঘাম-ক্লান্তিরা যায় ধুয়ে
সিক্ত হাওয়া যায় দেহ-মন ছুঁয়ে।

কবিতা

বর্ষার কাব্য

সমীরণ বড়ুয়া

গগন তলে মেঘ ছুটেছে যায় কী নিরুদ্দেশে?
ঘুমোটি বেঁধে ঝুম পাহাড়ে হাওয়ায় ভেসে ভেসে।
ডাক দিয়ে যায় গুরু, গুরু, কোথাও নাকো থামে-
বুকটা কাঁপে দুরু দুরু, বৃষ্টি হয়ে নামে।
মেঘের বাড়ি দেবোই পাড়ি, যাবোই অচিনপুরে
জোছনা রাতে চাঁদ তারাদের দেখব গগন জুড়ে।
উদাসী মেঘ, দো' পাটি মেঘ, বিষণ্ন মেঘ কালো
বিজলি হয়ে ধমকি মারো, কোথাও রে পাও আলো?
বিজলি দেখে চমকে উঠি, প্রাণ করে আনচান
বজ্র হয়ে আর কেড়ো না- সজীব শতেক প্রাণ।
বজ্র ডাকে ভয় পেয়ে যায়, রাখাল গরুর পাল
বৃষ্টি হয়ে ডুবাও তুমি, পুকুর বিল ও খাল।
রংধনুটির সাথে তোমার কেন গলায় ভাব?
ক্ষেতের ফসল নাও যে কেড়ে- হয় কী তোমার লাভ?
বারো মাসে রং বদলাও দেখাও শত রূপ-
বর্ষা হয়ে বৃষ্টি ঝড়াও থাকো না নিশ্চুপ।।
টাপুর টুপুর বৃষ্টি ফোটা ঝড়াও অবিরাম
হাঁটু জলে প্লাবিত আমার সবুজ গ্রাম।

সকাল আসে

কামাল হোসাইন

মেঘের ভাঁজে সকাল আসে
সকাল আসে দুলে–
সকাল আসে টুপটুপানো
শিশিরমাখা ফুলে।

ঝিকমিকানো রোদের ছোঁয়ায়
সকাল নামে ঘাসে–
পাখির ডাকে সকাল মুখর
উল্লাসে-উল্লাসে।

সকাল এলে খোকন জাগে
উঠল জেগে পাড়া–
ঘর থেকে সব বাইরে যাবার
ভীষণ রকম তাড়া।

সকাল এসে দেয় জানিয়ে
দিনের হলো শুরু–
আনতে সকাল মোরগ ডাকে
কুকুকুরুকুক কুরু।

তাই সকলে সকাল হবার
অপেক্ষাতে রই–
সকাল তোমার সঙ্গে রোজই
কত্ত কথা কই।

চিকুনগুনিয়া

ডা. হাফিজ উদ্দীন আহমদ

এক থোকা লিচু হাতে ডাক্তার মামা ঘরে ঢুকতেই নীলা ও রনি হাততালি দিয়ে এক যোগে চেঁচিয়ে উঠল- মা দেখো, মামা এসেছে। তারপর মামার হাত ধরে টানতে টানতে দরজা থেকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল।

ওদের চেঁচামেচিতে ব্যস্ত মা খুন্তি হাতে এক মুহূর্তের জন্য রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

কেমন আছিস? এতদিন পর আমার কথা মনে পড়ল?

ভালো আছি আপা।

বলতে বলতে ব্যালকনিতে চলে গেলেন তিনি। ওখানে রং-বেরঙের ফুলের সমারোহ।

মামা দেখো, আম্মু এসব লাগিয়েছে। খুব সুন্দর না? মামার মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল নীলা।

হ্যাঁ, সুন্দর। বলেই মামা এক পলকে সব ফুলগুলো দেখে নিয়ে একটু উবু হয়ে ক্ষিপ্র হাতে ফুলের টবগুলো উল্টে দিতে লাগলেন।

মা দেখে যাও। মামা সব ফুল গাছগুলো নষ্ট করছে।

নীলার চিৎকার শুনে ছুটে আসলেন তার মা।

তোর কী মাথা খারাপ হয়েছে? কী করছিস এসব?

কী করছি মানে! টবগুলো কাত করে পানি ফেলে দিচ্ছি। দেখো না ওগুলোতে পানি জমে আছে। এ রকম পানি জমলে এডিস মশা বাচ্চা দিবে, তখন চিকুনগুনিয়া হবে।

চিকনগুনিয়া আবার কী? শুনেছি ওটা হলে মানুষ চিকন হয়ে যায়। তাহলে তো আমার হলে ভালোই হয়। সবাই আমাকে মোটা বলে।

ছিঃ আপু, ওসব বলো না। রোগটার নাম চিকনগুনিয়া নয়। চিকুনগুনিয়া। এটা একটা মারাত্মক জ্বর। ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে।

ভাইরাস কী মামা?

ভাইরাস হলো আমিষ খোলসে আবৃত একটি সূক্ষ্ম জড় বস্তু। খালি চোখে দেখা যায় না। এই জড় বস্তুটিই শরীরের কোনো জীবন্ত কোষে ঢুকতে পারলে তা জীবিত হয়ে উঠে বংশবিস্তার করে।

কী সাংঘাতিক!

সাংঘাতিক তো বটেই। ভাইরাসের কতগুলো হলো ডিএনএ গোত্রের আর কতগুলো আরএনএ গোত্রের। চিকুনগুনিয়া হলো আরএনএ ভাইরাস। এডিস জাতীয় মশা এই ভাইরাস বহন করে। কোনো মশা যদি চিকুনগুনিয়া রোগীর রক্ত পান করে তারপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে দংশন করে তার এ রোগ হবে।

কী করে বুঝব মামা যে এ রোগ হয়েছে?

রোগীর তীব্র জ্বর হবে। শরীরে লাল র‍্যাশ দেখা দিবে, মাথা ধরবে, বমি বমি লাগবে আর সেই সাথে মাংসপেশি ও জোড়ায় জোড়ায় থাকবে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথা এত তীব্র হতে পারে যে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাবে। এ রোগে অনেকটা ডেঙ্গুর মতো লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসকরা এটাকে ডেঙ্গু বা জিকা ভাইরাস বলে ভুল করতে পারেন। তবে রোগের তীব্রতা থাকতে থাকতে প্রথম সপ্তাহে রক্ত পরীক্ষা করলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

রোগটা কী নতুন? আগে এর নাম তো শুনিনি।

নতুন নয়। ১৯৫২ সালে প্রথম আফ্রিকা মহাদেশের তানজানিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে এটা দেখা দেয়। এখন অন্যখানেও ঘটে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের ৬০টি দেশে এ রোগ দেখা গেছে।

চিকুনগুনিয়া নামটা এসেছে কিমাকন্ডে ভাষা হতে যার অর্থ কুঁকড়ে যাওয়া। এ রোগ হলে মাংসপেশিও জোড়ায় জোড়ায় এত বেশি ব্যাথা হয় যে রোগী সত্যিকার অর্থেই কুঁকড়ে যায়। এ ব্যথা সাধারণত

সবে মিলে মশা মারি

মনজুরুর রহমান

এডিস নামের লেডিস মশা
যদি কামড়ায় সকালে,
ডেঙ্গু নামের মরণ জ্বরে
অক্কা পাবেন অকালে!

আয় তবে তাড়াতাড়ি
সবে মিলে মশা মারি।

কয়েকদিন থাকে তবে কয়েক সপ্তাহব্যাপী থাকতে পারে এমনকি বছরখানেক থাকাও বিচিত্র নয়। মাঝে মাঝে চোখে বা হৃৎপিণ্ডেও অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। মশক-দংশনের ৪/৮ দিন পর এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে তা ২-১২ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

এ রোগে কী চিকিৎসা করতে হবে ?

এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই আবার প্রতিষেধক টিকাও নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে। ডাক্তাররা প্যারাসিটামল খেতে ও প্রচুর পানি পান করতে বলেন। তবে ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল ছাড়া এনএসআইডি জাতীয় ওষুধ যথা ক্লোফেনাক ইত্যাদি খাওয়া যাবে না। যা করতে হবে তা হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বাড়ির পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে হবে। ফুলের টব, টায়ার, পরিত্যক্ত পাত্র ইত্যাদিতে পানি জমতে দেওয়া যাবে না যাতে মশা ডিম পাড়তে না পারে। এডিস মশাগুলো সাধারণত দিনের বেলা বিশেষত সকাল ও বিকালবেলা কামড়ায়। যে এলাকায় রোগ ছড়িয়েছে সে সব এলাকায় মশার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লম্বা হাতার জামা, পায়জামা বা ফুল প্যান্ট পরতে হবে। হাতে -পায়ে মশা তাড়াবার ক্রীম মাখা যায়।

কেন, মশার কয়েল ব্যবহার করলেই তো হলো।

মশার কয়েল ভালো নয়। আমাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যায় শরীরের আনাচে-কানাচে। কয়েলের ধোঁয়াতে প্রাণঘাতী কার্বন মনোক্সাইড থাকে। শ্বাসের সাথে তা ফুসফুসে প্রবেশ করলে রক্তের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের পরিবর্তে কার্বন মনোক্সাইডের প্রতি ২১০ গুণ বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে রক্তে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। শ্বাসকষ্ট হয়, এমনকী মৃত্যুও ঘটতে পারে।

আমার ভয় করছে মামা।

ভয় নেই নীলা। চিকুনগুনিয়াতে সাধারণত কেউ মারা যায় না, তবে এপ্রিল ১৯১৫ তে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও ল্যাটিন আমেরিকাতে এ রোগের তাণ্ডবে ১৯১জন মৃত্যুবরণ করেছিল, তাই সচেতন থাকবি।

মামা তারপর রান্নাঘরে ঢুকে ভাজতে থাকা গরম গরম দুটা সিঙারা সাবড়ে দিয়ে বললেন -

আপু, সাবধানে থেকো। চিকুনগুনিয়া হলে চিকন হবে ঠিকই তবে তা রোগে ভুগে, না খেতে পেরে। আমি চললাম। নাইট ডিউটি আছে।

যেমনি এসেছিলেন তেমনি মুহূর্তে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

চলে গেলেন হরিধানের উদ্ভাবক হরিপদ কাপালী

বিশেষ জাতের উচ্চ ফলনশীল হরিধানের উদ্ভাবক হরিপদ কাপালী। ১৯৯২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ সদর উপজেলার এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কুঞ্জুলাল কাপালী মা সরোধনী। তিনি ২০১৭ সালের ৫ জুলাই না ফেরার দেশে চলে যান।

১৯৯৫ সালে একদিন হরিপদ নিজের ধানক্ষেতের মধ্যে একগোছা বাড়ন্ত ধানগাছ দেখতে পান, যা অন্য ধানগাছের চেয়ে একটু উঁচু ও বেশি হৃষ্টপুষ্ট এবং ধানের শীষে অন্যগুলোর চেয়ে তুলনামূলক বেশি ধান ছিল। ধান পাকার পর ঐ গোছার ধানগুলো আলাদা সংগ্রহ করে বীজ তৈরি করেন তিনি। পরের বছর সেই বীজ দিয়ে আবাদ করে আশাতীত ফলন পান। এরপর প্রতিবছর পর্যায়ক্রমে ধানের বীজ তৈরি করে ধানের আবাদ বাড়িয়ে চলেন। সাধারণ ধানে বিঘা প্রতি ফলন যেখানে ১৫ মণ, সেখানে হরিধান ফলে ২০-২২ মণের মতো। উচ্চ ফলনের কারণে হরিপদের কাছ থেকে সেই ধানের বীজ নিয়ে প্রথমে তাঁর নিজ গ্রাম আহসাননগর ও আশপাশের গ্রামের কৃষকরা আবাদ শুরু করেন। পরে অন্য জেলার কৃষকরাও সেই বীজ সংগ্রহ করেন। ধানটি দিনে দিনে এলাকায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

হরিপদের উদ্ভাবিত ধানের খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয়। তখন বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ সরকরি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নজরে আসে এবং সরকারিভাবে তাঁর ধানের স্বীকৃতি মেলে। নাম দেওয়া হয় 'হরিধান'। *প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম*

ছড়া

তানজিন দেলওয়ার খান (রিজ)

প্রজাপতি প্রজাপতি
যাচ্ছ কোথায় একা,
ভালোই হলো সকালবেলা
তোমার পেলাম দেখা।

আজ আমার পুতুল বিয়ে
রইল তোমার নিমন্ত্রণ
দুপুর বেলায় সময় করে
বেড়িয়ে যেও কিছুক্ষণ।

তুমি এলে খুশি হবে
পুতলির মা মিনা,
বিয়ে বাড়ি হইচই
তাক ধিনাধিন ধিনা।

ব্যাঙ নাচে ফড়িং নাচে
দোয়েল গায় গান,
বুড়ো দাদু খায় বসে
মিষ্টি খিলি পান।

*৮ম শ্রেণি, ফয়জুর রহমান
আইডিয়াল ইনস্টিটিউট,
বনশ্রী শাখা, ঢাকা*

ঈদ

সাইদুল ইসলাম

বছর ঘুরে আবার এল
মহাখুশির দিন,
বাজছে সুখের বীণ,
এই দিনেতে সবাই সবার,
সুখগুলো অমলিন।

ঈদগাহেতে যাবে সবাই
নতুন জামা পড়ে,
আনন্দে বুক ভরে
ধনী-গরীব সবাইকে আজ
নিবো আপন করে।

নবম শ্রেণি, কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

ট্রেন

মোঃ রিদওয়ানুল ইসলাম রিফাত

ট্রেন চলে ঝকঝক,
ছুটে চলে অবিরাম,
হুইসেলে কথা বলে,
নেই কোনো বিশ্রাম।
দিক-দিগন্ত বেড়ায়,
নিজ গতির বেগে,
আর কে বা জোরে যাবে,
ট্রেনের থেকে।
হঠাৎ থামে স্টেশনে,
যাত্রীদের তুলবে বলে,
আবার সে দেয় ছুট
যাত্রীদের তোলা হলে।
এই দেখো না,
ট্রেনটাকে ভাই,
ট্রেনের বাড়ি কোথায়?
জানতে না পাই,
একটু ভেবে বলো না ভাই,
কোথায় গেলে থামবে সে।
নাকি শুধু ঝড়ের গতিতে,
দেশ-বিদেশে বেড়ায় সে।

নবম শ্রেণি, মর্নিং গ্লোরী স্কুল, গাজীপুর

বৃষ্টি

সালেহীন শরীফ

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
টিনের চালে বাজে নূপুর
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝমিয়ে
মাঠঘাট গেল তলিয়ে।
বৃষ্টি পড়ে গাছের ডালে
কাকগুলো ভিজছে তালে
বৃষ্টি পড়ে পুকুর পাড়ে
ব্যাঙগুলো গাইছে ধারে।

৫ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল, ঢাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ

প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী এবং অটিজম আক্রান্ত লোকজনকে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন এবং তাদের মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কার্যকর নীতি এবং কর্মসূচি গ্রহণে বিশ্বের সকল দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আসুন আমরা এদের বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকৃতি প্রদানে সংকল্পবদ্ধ হই, যাদের এই অসামঞ্জস্যতায় কোনো চিকিৎসা নেই তাদের মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপনের সুযোগ করে দেই। যাতে করে তারা সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ এপ্রিল ভুটানের থিম্পুতে অটিজম এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বিষয়ক তিনদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন পর্বে বিশেষ অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত সুনামগঞ্জে

শীর্ষস্থানে থাকাটা সবসময় যে গৌরবের হয় তা নয়। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ সুনামগঞ্জ জেলার বজ্রপাত। কিছুদিন আগে হাওরের বাঁধ ভেঙে ফসল বিপর্যয়ে পড়া সুনামগঞ্জের আরেক বিপদ হচ্ছে বজ্রপাত। সারাবিশ্বে মার্চ থেকে মে-এই তিন মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় সুনামগঞ্জে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসা ও মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে আসে। স্যাটেলাইট থেকে নেওয়া ১০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই গবেষণা করা হয়েছে। ওই গবেষণায় এশিয়ার বজ্রপাতপ্রবণ এলাকার মধ্যে নোয়াখালী পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।

নাসা ও মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় বলা হয়েছে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কঙ্গোর কিনমারা ডেসকেপ এলাকায়, মার্চ থেকে মে পর্যন্ত বাংলাদেশের সুনামগঞ্জে এবং জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভেনিজুয়েলার মারাকাইবো লেক এলাকায় সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত আঘাত হানে। সারা বছরের হিসাবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত আঘাত হানে এই এলাকায়। সেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৩২ বারেরও বেশি বজ্রপাত হয়। আর সুনামগঞ্জে তিন মাসে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৫ বারের বেশি বজ্রপাত আঘাত হানে।

তবে প্রতি বছরই দেশে বজ্রপাতের সংখ্যা বাড়ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে ২০১৪ সালে সারাদেশে ৯১৮টি বজ্রপাত আঘাত হেনেছিল। ২০১৫ সালে ১ হাজার ২১৮ বার, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দেড় হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইসলাম সম্পা

নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য

ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিযোগ বাক্স

ইভটিজিং প্রতিরোধে প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিযোগ বাক্স রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যেখানে অভিযোগকারীরা তাদের অভিযোগগুলো চিঠি আকারে বাক্সে জমা রাখবে। সেগুলো আমলে নিয়ে সরকার ইভটিজারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। ১৩ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে এক মানববন্ধনে অংশ নিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এসব কথা জানান।

উত্ত্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইভটিজারদের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্সে রয়েছে। সেজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিযোগ বাক্স রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইভটিজিংয়ের কারণে অনেক মেয়েকে বাল্যবিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে বাবা-মা তাই সরকারের পাশাপাশি অভিভাবকসহ সকলকে আরো সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান মেহের আফরোজ চুমকি।

সাইকেল চালিয়ে স্কুল যাত্রা

আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, নারী নির্যাতনকে পরোয়া না করে শত শত কিশোরী মেয়ে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাতায়াত করছে। নড়াইল, যশোর, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় চোখে পড়ে দল বেঁধে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাওয়ার এমন দৃশ্য। সম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকায় 'দল বেঁধে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাই' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে কিছু অংশ নবারুণের বন্ধুদের জন্য তুলে ধরছি।

নড়াইলে গুয়াখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০০-এরমধ্যে ১৪৩ জন মেয়ে। একশ'র মতো মেয়ে সাইকেল চালিয়ে দল বেঁধে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছে।

প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, সাইকেলে আসা ওদের জন্য সহজ। আমরাও সাইকেলে আসতে

উৎসাহিত করি। কারণ একসঙ্গে দল বেঁধে এলে নিরাপত্তা নিয়ে ভয় থাকে না। ছাত্রীদের আসা-যাওয়ার পথে কেউ আজেবাজে কথা কিংবা কটূক্তি করলে শক্ত হাতে সামাজিকভাবে তা নিরসন করা হয়। মেয়েরাও এখন প্রতিবাদ করতে শিখেছে।

পঞ্চগড়ের একটি স্কুলের সহস্রাধিক মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬০০-এর মতো মেয়ে সাইকেলে চড়ে যাতায়াত করে। অভিভাবকের পাহারায় নয়, একা, কোনো জড়তা নেই তাদের পোশাক ও আচরণে। সাইকেল চালিয়ে এদের স্বতস্ফূর্তভাবে স্কুলে আসার দৃশ্য দেখে মনে হয় এরাই বেগম রোকেয়ার প্রকৃত উত্তরসূরি।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

এগারো বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফিরেই চমকে দিয়েছে বাংলাদেশ। গত বিশ্বকাপের ফাইনালের দুই দলকে বিদায় করে টাইগাররা পৌঁছে যায় শেষ চারে। এবারই প্রথম আইসিসির কোনো টুর্নামেন্টে সেমিফাইনাল খেলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।

গত বিশ্বকাপে মাশরাফি বিন মর্তুজার দল খেলেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। সেবারই প্রথম আইসিসির টুর্নামেন্টের শেষ আটে খেলেছিল বাংলাদেশ। আর সেটাই ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সেরা সাফল্য। এছাড়াও এশিয়া কাপ ও এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির ফাইনালে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নতুন কন্ডিশনে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো গ্রুপ থেকে শেষ চারে যাওয়া মোটেও সহজ ছিল না। তারপরেও টাইগাররা খেলে যায় নিজেদের সেরা খেলা দিয়ে।

ইংল্যান্ডের কাছে হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা বাংলাদেশ পরের ম্যাচে বৃষ্টির জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পরিত্যক্ত হওয়া ম্যাচ থেকে পেয়ে যায় এক পয়েন্ট, টুর্নামেন্টে টিকে থাকে টাইগারদের দল। শেষ বাঁচা-মরার ম্যাচে সাকিব আল হাসান-মাহমুদউল্লাহর ব্যাটিং বীরত্বে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে বেঁচে থাকে শেষ চারে খেলার আশা। বাংলাদেশের পয়েন্ট ৩। তবে স্বপ্নের সেমিফাইনালে ওঠার সমীকরণটা রয়ে যায় ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের ওপর।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলে অস্ট্রেলিয়া যেত সেমি-ফাইনালে। পারেনি স্টিভেন স্মিথের দল। স্বাগতিকদের কাছে ডাকওয়ার্থ ও লুইস পদ্ধতিতে হেরে যায় ৪০ রানে। গত বিশ্বকাপে যাদের বিদায় করে শেষ আট নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ, এবার তাদের জয়েই নতুন উচ্চতায় উঠে গেল বাংলাদেশ দল। রচনা হয় নতুন ইতিহাসের।

আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা ইংল্যান্ড দল ৬

পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের সেরা দল। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ। এজবাস্টনে দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে। ভালো খেলেও হেরে যায় সেমিফাইনালে। স্বপ্ন ভেঙে যায় আরেকটি ফাইনাল খেলার। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের উর্ধ্বমুখী পারফরম্যান্স সবার প্রশংসা অর্জন করে। প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে খেলার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে নবারুণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

খেলতে খেলতে বুদ্ধি বাড়াও

সারা বিশ্বে দাবা ও সুডোকু বুদ্ধিমানের খেলা হিসেবে বিবেচিত। গবেষক এবং বিভিন্ন বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী এসব খেলাকে ব্রেইন গেম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবারুণের বন্ধুরা তোমরাও অবসরে এই খেলার মাধ্যমে তোমাদের মস্তিষ্ককে শাণিয়ে নিতে পারো।

দাবা

দাবা একটি জনপ্রিয় খেলা যা বোর্ডের উপর খেলা হয়। যিনি দাবা খেলেন তিনি 'দাবাড়ু' হিসেবে আখ্যায়িত হয়। দাবা খেলায় জিততে হলে বোর্ডের ওপর ঘুঁটি সরিয়ে বা চাল দিয়ে বিপক্ষের রাজাকে ফাঁদে ফেলে 'খেতে' বা নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। দাবার পরিভাষায় একে বলে 'কিস্তিমাত'।

দাবা খেলার নামটা মূলত এসেছে ফার্সি শব্দ 'শাহ' থেকে। যার অর্থ রাজা। দাবার বোর্ড তৈরি হয়েছে ভারতে। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

বুদ্ধির খেলা সুডোকু

মাথা খাটাতে চাইলে সুডোকু একটি আদর্শ খেলা। সুডোকু ছকে ৮১টি ঘর আছে। এই ৮১টি ঘর আবার ৯টি ছোটো ছোটো বর্গে বিভক্ত। প্রতিটি ছোটো বর্গে ৯টি করে ঘর আছে। খেলার শুরুতে কিছু কিছু ঘরে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর কয়েকটি বসানো থাকে। বেশি সংখ্যা বসানো থাকলে সমাধান করা সহজ। যত কম সংখ্যা শুরু থেকে বসানো থাকবে সমাধান করা ততো কঠিন হবে।

এশিয়ার খেলা গো

'গো' খেলাটি সৃষ্টি হয়েছে চীনে। তবে এর উন্নয়নে বড়ো ভূমিকা রেখেছে কোরিয়া ও জাপান। কালো ও সাদা পাথর একটি বোর্ডের উপর রেখে খেলাটি খেলতে হয়। যেখানে ১৯টি অনুভূমিক ও ১৯টি উলম্ব রেখা টানা থাকে। বোর্ডের অধিকাংশ অংশ যে দখলে রাখতে পারবে সে-ই বিজয়ী।

টিক-টেক-টো

এই খেলাটির বাংলা নাম কাটাকুটি খেলা। দীর্ঘ ভ্রমণের পথে দ্বাদশ শতক থেকে চলে আসা এই খেলাই সম্ভবত সেরা। এই খেলাটির জন্য শুধু একটি পেন্সিল ও এক টুকরো কাগজ দরকার। কাগজের ওপরে আঁকা নয়টি ঘরের মধ্যে দুজন খেলোয়াড় ক্রস বা সার্কেল আঁকেন। যে খেলোয়াড় আগে এইরকম সংকেত দিয়ে যে অনুভূমিক উলম্ব কিংবা আড়াআড়িভাবে তিনটি ঘর ভরতে পারবে সে-ই বিজয়ী।

অবসরে স্টারক্রাফট

কারো কারো কাছে এটা হয়ত নিখাঁদ বিনোদন। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার স্টারক্রাফট হচ্ছে অবসর সময়ের জন্য উপযোগী জাতীয় খেলা। 'রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি' খেলাটি চালু হয় ১৯৯৮ সালে। আর তখন থেকেই এটি অন্যতম জনপ্রিয় কম্পিউটার গেম হিসেবে বাজার দখল করে আছে।

কম্পিউটার গেম সিভিলাইজেশন

শুরুতে বোর্ড গেম হিসেবে চালু হওয়া সিভিলাইজেশন এর যাত্রা শুরু ১৯৮০ সালে। খেলার ধারণা জটিল ছিল। একটি সিভিলাইজেশনকে সেই লৌহযুগের প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে টিকে থাকতে হবে। ৭ জন খেলোয়াড় একসঙ্গে এটি খেলতে পারে। ১৯৯১ সালে 'সিভিলাইজেশন' কম্পিউটার গেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

আনন্দ সংবাদ

ছোট্ট বন্ধুরা, বই পড়তে কে না ভালোবাসে। তোমরাও নিশ্চয়ই ভালোবাসো। আর সেই বইগুলো যদি হয় গল্প-রূপকথা-ছড়া-কবিতার তাহলে তো আরো মজা! আর তাই তোমাদের জন্য এসব নানান রকমের মজার মজার বই নিয়ে এসেছে 'শৈশব প্রকাশ'। হ্যাঁ, শৈশব প্রকাশ এমনি একটি প্রতিষ্ঠান যারা শিশুদের উপযোগী অনেক মজার বই ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। আর এসব বই লিখেছেন দেশের সুপরিচিত শিশু সাহিত্যিকরা।

তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আখতার হুসেন, শাহজাহান কিবরিয়া, রফিকুর রশীদ, রাশেদ রউফ, মুস্তাফা মাসুদ, মনি হায়দার, সরকার আবদুল মান্নান, মোস্তফা হোসেইন, আনজীর লিটন, স.ম.শামসুল আলম ছাড়াও অনেকে। যারা লিখেছেন গল্প, রূপকথা, ছড়া-কবিতা, অনুবাদ, রং-ছবি আঁকার বইসহ আরো কত কী! যেখানে সাধারণ জীবনের গল্পকথা যেমন আছে, তেমনি আছে কল্পকথা। পরিবেশ সচেতন নিয়ে গল্পকথাসহ আছে পশুপাখি নিয়ে মজার গল্প। মোটকথা, শিশুদের স্বপ্নের মতোই রঙিন এসব বই।

গল্পের মাধ্যমে শিশুদের শেখানোই শৈশব প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রতিবছর একুশের বই মেলায় শৈশব প্রকাশ-এর স্টল থাকে। তাছাড়া শৈশব প্রকাশ শুধুমাত্র দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের বাইরেও যেমন লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, কলকাতার বই মেলায় শৈশব প্রকাশ-এর নিয়মিত অংশগ্রহণ থাকে। আগামীতে বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে শিশু-কিশোর পাঠকদের নিয়ে শৈশব প্রকাশ-এর অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনাও রয়েছে। ২০১৭ সালে এ পর্যন্ত শৈশব প্রকাশ-এর ছোটোদের বই প্রকাশিত হয়েছে মোট ৫৫ টি। বইগুলোর নামই বলে দেয় প্রত্যেকটি বইয়ের ভিতর চমৎকার কিছু জানা ও শেখার আছে।

এবার চলো বন্ধুরা, শৈশব প্রকাশ-এর তেমনি কিছু চমৎকার বইয়ের নাম জেনে নিই। যেমন: *গানের সুরে অনেক দূরে, কাঁকড়া ও বকের গল্প, শাদা বকের গল্প, গাছ বাড়ির গল্প, ভূত কোথায় থাকে, মায়ের জন্য উপহার, পাখির জন্য ভালোবাসা, এসো শখের বাগান করি, বই লিখে রাজা হব, সোনার শহর সোনার গাঁ, আমাদের ইশকুলে পরীক্ষা নেই, স্কুলে যেতে ভয় নেই, বিপদ আনে অহংকার, বিড়ালের গলায় ঘন্টা, ইঁদুর বিড়ালের ছড়া* ইত্যাদি।

বন্ধুরা, তোমরা ইচ্ছা করলে নিম্ন ঠিকানা থেকে বইগুলো সংগ্রহ করতে পারো:

কথা প্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কথা প্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট, তৃতীয় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

পাঠক সমাবেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

বর্ণালী বইঘর, ৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

ঢাকার বাইরেও শৈশব প্রকাশ-এর বই পাওয়া যায়। আর এজন্য তোমাদের নিজ জেলার সৃজনশীল লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

নাফিশা জাহান খান, দ্বিতীয় শ্রেণি, হলি ব্রাইট মডেল স্কুল, ভালুকা, ময়মনসিংহ

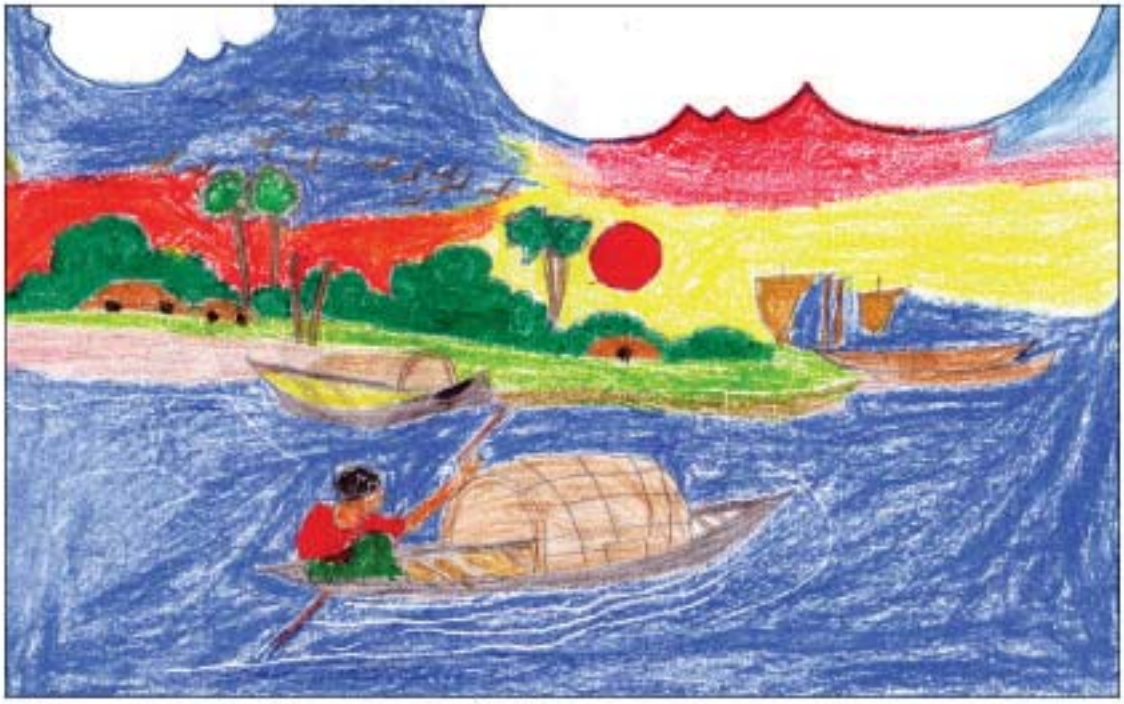

লামিয়া আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, মডেল একাডেমি, মিরপুর, ঢাকা

ইসতিয়াক আহমেদ আবির, তৃতীয় শ্রেণি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

ওকি, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, পাইকপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা

রাইদা জামান, তৃতীয় শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, ঢাকা

সাদিয়া হোসেন মিম, তৃতীয় শ্রেণি, এভারগ্রীণ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বাড্ডা, ঢাকা

প্রিয়তি সালেহ উদ্দিন, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ক্রেস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, আদাবর, ঢাকা

তাসনোভা আলম লিশান, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল, ঢাকা